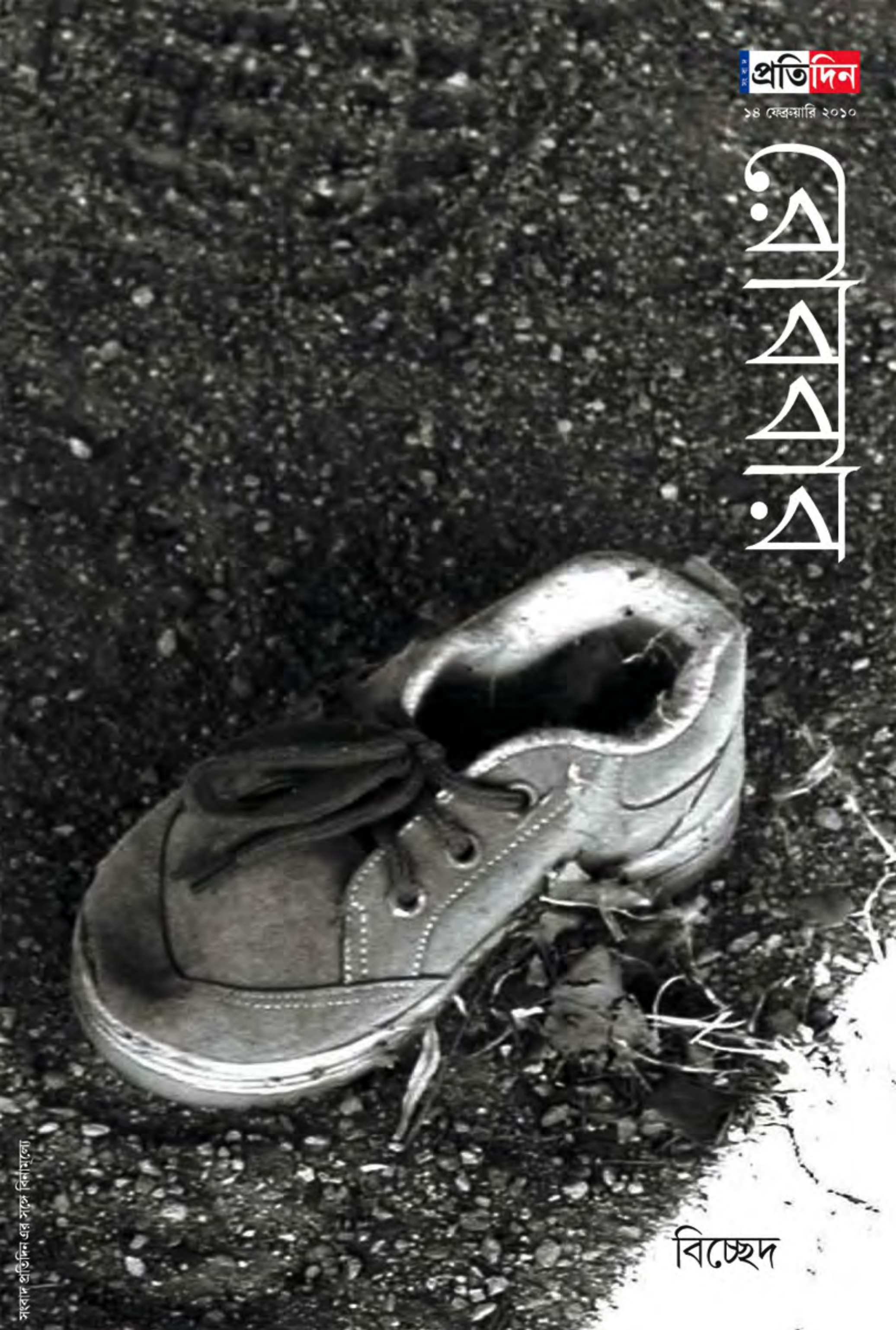


প্রতিদিন

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০

রোববার

বিচ্ছেদ

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com


রবিবার খোলা
এখন আরো 2টি নতুন শোরুম - গোলপার্ক : 6536 2328 আর ভবানীপুর : 2455 1413
LOVE YOU HAMESHA
ন্যূনতম 2000 টাকার কেনাকাটায় পাবেন বাছাই করা হিন্দী গানের CD !!
7-14 FEB
Rs. 850/-
Rs. 1400/-
Rs. 850/-
Rs. 1650/-
Rs. 1400/-
Rs. 1400/-
Rs. 750/-
Rs. 3500/-
Rs. 1600/-
Rs. 5500/-
Rs. 1900/-
Rs. 600/-
Rs. 750/-
Rs. 1600/-
Rs. 700/-
Rs. 1650/-
Rs. 1100/-
Rs. 3200/-
Rs. 400/-
Rs. 250/-
*শর্তাবলী প্রযোজ্য।
অফার স্টক থাকা পর্যন্ত সীমিত।
nnoni
contemporary jewellery
An Anjali Jewellers Initiative
Because You are in love!
বেলেঘাটা ~ শ্রীকৃষ্ণ গার্ডেন, ১/১ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, আলোছায়া সিনেমা হলের পাশে, কলকাতা ৮৫, ফোন : ২৩৬৩ ৯৮৫২ ■ বেহালা ~ ৫২২সি, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৩৪, ফোন : ২৪৮৮ ৯৯৮২ ■ গড়িয়া মহামায়াতলা ~ লব কুশ এ্যাপার্টমেন্ট, তেঁতুলতলা, ২০৮ গড়িয়া মেন রোড, কলকাতা ৮৪, ফোন : ২৪৩৫ ২৯১৮ ■ বাটানগর ~ এফ ৪-২০/১৮২/১-২ নুঙ্গি স্টেশন রোড, পারবাংলা, বাটানগর, ২৪ পরগনা (দঃ), ফোন : ২৪৯২ ৪১১১ ■ বাঘাযতীন ~ ৬৮বি/৩০ রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, বাঘাযতীন মোড়, কলকাতা ৯২ ফোন : ২৪২৯ ৭৭০৯ ■ মধ্যমগ্রাম ~ ৬০এ বিজয়নগর, সোদপুর রোড, ২৪ পরগনা (উঃ) কলকাতা ১২৯, ফোন : ২৫২৬ ৭৬২২ ■ চন্দননগর ~ শিবা ম্যানসন, ১২০৮ জি. টি. রোড, পাদ্রী পাড়া, চন্দননগর, হুগলী, ফোন : ২৬৮৩ ০১৪২ ■ হাওড়া ~ ১০, কেদার মুখাৰ্জ্জী লেন, মঠ বাগান ক্লাবের কাছে, স্কুল লাইব্রেরী স্টপেজ, কদমতলা, হাওড়া, ফোন : ২৬৬৭ ১০৫৫ ■ নাগেরবাজার ~ ৪৫৮ বি, যশোর রোড, সাতগাছি মোড়ের কাছে বাটার পাশে, বাজার স্টপেজ, দমদম, কলকাতা ৭৪, ফোন : ২৫৬০ ০৪৪৬ ■ বিডন স্ট্রীট ~ ২৭৯/এ, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, বিডন স্ট্রীট ক্রসিং-এর কাছে, কলকাতা ৬, ফোন : ২৫৩০ ৭৯০৮ ■ হাতীবাগান ~ ১৪৬, বিধান সরণী, স্টার থিয়েটারের বিপরীতে, কলকাতা ৬, ফোন : ২৫৫৫ ১৯১৯ নতুন শোরুম ভবানীপুর ~ ১২০, আশুতোষ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলকাতা ২৫, ফোন : ২৪৫৫ ১৪১৩ ■ গোলপার্ক ~ ২৩/৩৭, গড়িয়াহাট রোড, রামকৃষ্ণ মিশনের বিপরীতে, কলকাতা ২৯, ফোন : ৬৫৩৬ ২৩২৮
■ এছাড়া আমাদের আর কোন শাখা নেই। দোকান খোলা প্রতিদিন সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত।
Help line : 98300 76691 (তীর্থ), 9831007117 (কুনাল রায়চৌধুরী)
customercare@nnoni.in | www.nnoni.in
Silver | Pearl | Costume

প্রতিদিন

রোববার

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী,
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, বিপুল গুহ, ভাস্কর লেট, রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার, শান্তনু দে, সন্তোষ দত্ত, সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে



Rediffusion-Y&R/Kol/SG/0445/D





বিচ্ছেদ ছাড়া কোনও প্রেম পূর্ণতা পায় না—তাই তো শুনে এসেছি চিরকাল।

পরিণয় যদি প্রেমের গন্তব্য হয়, তবে বিচ্ছেদ হয়তো বা এক অদৃশ্য ভবিতব্য। প্রেম কবে পরিণয়ের পূর্ণতা পাবে—সেই স্বপ্ন দিয়ে যেমন শুরু হয় যে কোনও প্রণয়যাত্রা; বিচ্ছেদও যে অদৃশ্যে এক গোপন আততায়ীর মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রেমের সেই জটিল সরণির কোনও এক বাঁকে—এই দুঃস্বপ্ন ছাড়াই বা কোন প্রেম কবে এগিয়েছে এক পা?

যেদিন থেকে প্রণয় শুরু হয়, শুরু হয় এক চূড়ান্ত চিরকালীন মিলনের স্বপ্ন দিয়ে, পাশাপাশি বিচ্ছেদ এসে কবে কীভাবে চুরমার করবে সেই কাঙ্ক্ষিত পৃথিবী, এও যেন প্রেমের পথ চলার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মিলনের চেহারা অনেকটা প্রত্যাশিত। বিচ্ছেদ কখন কীভাবে কবে এসে দাঁড়াবে দুই প্রণয়ীর মাঝখানে—তা নিয়ে সারাজীবনের নানা গোপন জল্পনা-কল্পনা। এই একটা জায়গায় হয়তো প্রণয়ীযুগলও ভিন্নমত। দু'জনেই বিচ্ছেদকে হয়তো দেখেন দু'টো বিপরীত সম্ভাবনার ছায়ায় দাঁড়িয়ে। কোথাও কোথাও সেই সদাকম্পমান অতিকায় ছায়া আঙুলে আঙুল মেলায়—কোথাও থাকে আলাদা।

'ডিভোর্স' কথাটা আমাদের ছোটবেলায় একটা অসামাজিক শব্দ ছিল। কারণ আজন্মবিচ্ছিন্ন দম্পতিরাও সামাজিক চির-সহবাস করে প্রমাণ করে দিতেন যে সঙ্গে থাকাটাই আসল সত্য।

আজ সেই 'ডিভোর্স' শব্দটারই অন্য একটা মানে স্বাধীনতা। অদৃশ্য বিচ্ছেদের গ্লানি থেকে দৃশ্যমান মুক্তির এক প্রসারিত সংজ্ঞা।

আগে আমরা জানতাম, কোনও সম্পর্কের অন্তিমতা যে কোনও একজনের আয়ুষ্কাল দিয়ে নির্ধারিত। আজ আমরা জানি, এবং প্রায় সবসময় সচেতনভাবে মনেও রাখি যে, সব সম্পর্কেরই একটা expiry date আছে। সেটা কে ঠিক করবে—প্রাণহীনতা না প্রেমহীনতা, আমরা জানি না।

এখন ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে-র সময়। প্রেমকে বিভূষিত করার বসন্তসমাগম। কিন্তু যে-প্রেম অবধারিতভাবে এগিয়ে যাবেই মিলনকে পার করে কোনও একদিন কোনও বিচ্ছেদ বৈতরণীর পারে—প্রণয়ের সেই জটিল অবাঞ্ছিত অবশ্যম্ভাবিতাই আমাদের এই সংখ্যার বিষয়।

মিলনকে বিচ্ছেদ দিয়ে, বা বিচ্ছেদকে আরও বড় কোনও যোগাযোগ ভেবে যাঁরা নিজেদের সম্পর্কের হাত ধরে এগিয়ে চলেছেন সেই সব প্রণয়ীর জন্য ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে-র শুভেচ্ছা রইল।





পরিচয়, ভাল লাগা বইটির সঙ্গে

'আন্তিগোনি' পড়েছিস?

সোফোক্লিস! কে না পড়েছে?

দূর! সোফোক্লিস নয়। জাঁ আনুজ, (Jean Anouilh) ফরাসি উচ্চারণ করল কেয়া।

জাঁ আনুই-এর 'আন্তিগোনি'! তুমি পড়েছ?

এই নে। বাড়ি গিয়ে শেষ কর! ফেরত দিবি কিন্তু।

এক শীতের বিকেলে, ষাটের দশকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে চিলতে বইটি শালের তলা থেকে বার করে আমার হাতে দিয়েছিল তখনই-বেশ-বিখ্যাত কেয়া চক্রবর্তী।

মনে আছে, সময় নষ্ট না করে, বাড়ি ফেরার ট্রাম ধরেছিলাম। বসার জায়গাও পেয়েছিলাম। এবং বইটি পড়তে শুরু করেছিলাম মুহূর্তে।

আড়াই হাজার বছর আগে সোফোক্লিস-এর 'আন্তিগোনি' প্রথম অভিনীত হয়েছিল অ্যাথেন্স-এ। আর ১৯৪২-এর প্যারিসে প্রথম অভিনীত হল আনুই-এর আন্তিগোনি—যে-প্যারিসের পশ্চাৎপটে তখন হিটলারের বাহিনী কঠোর বিন্যাসে। তাদের বুটের শব্দে দীর্ণ প্যারিসের প্রতিটি দিনরাত। সোফোক্লিস-এর নায়িকা আজও পুরানো হয়নি। সে তার অসহায় নরম শীর্ণ মুঠি উঁচিয়েই আছে বিপুল বিদ্রোহে, কখনও আনুই-এর নাটকে নাৎসি অত্যাচারের বিরুদ্ধে, কখনও ব্রেশট-এর নাটকে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিজম বা আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধেও। পৃথিবীর যেখানেই পচছে সাধারণ মানুষ বলবানের অত্যাচারে, সেখানেই আন্তিগোনির বিদ্রোহ।

জাঁ আনুই, ফরাসি নাট্যকার, নামটি উচ্চারিত হলে এখনও নতজানু হয় মুগ্ধতা। তাঁর লেখা একটির পর একটি নাটক—'আন্তিগোনি', 'বেকেট', 'দ্য লার্ক'—কত বিতর্ক-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা—মিশে আছে আমাদের যৌবনের কফি হাউস-রসায়নের সঙ্গে! কলকাতার চায়ের কাপে একদা তুফান তুলেছিলেন ১৯১০-এ জন্মানো, প্যারিসে-লেখক-হয়ে-ওঠা, বিজ্ঞাপন-এজেন্সিতে-কাজকরা এবং প্রায় তিরিশটি নাটকের রচয়িতা জাঁ আনুই। ক্রমশই তাঁর নাম শুনছিলাম। ইউরোপের হাওয়া যতটুকু এসে পৌঁছত, তাতেই ভেসে আসছিল তাঁর নাম। তাঁকে প্রথম পড়লাম ট্রামে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে কেয়ার সৌজন্যে। কেয়ার কাছে অনেকভাবেই আমি কৃতজ্ঞ।

১৯৪৯-এর ১০ ফেব্রুয়ারি। লন্ডনের নিউ থিয়েটার। ওল্ড ভিক থিয়েটার কোম্পানির প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হল আনুই-এর ইংরেজি 'আন্তিগোনি'। 'আন্তিগোনি'র ভূমিকায় ভিভিয়েন লি। আর কোরাস স্বয়ং স্যর লরেন্স অলিভিয়ের। সেই হিরণ্ময় প্রোডাকশান দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য কোনওদিনই ঘটেনি এই বিত্তমধ্য বাঙালি-জীবনে। তবু যখনই পড়ি জাঁ আনুই-এর আন্তিগোনি-র কোরাসকথিত লাইনগুলো, শুনতে পাই অলিভিয়ের-এর অনির্বচনীয় কণ্ঠস্বর, তাঁর অবিকল্প উচ্চারণ :

Well, here we are. These people are about to act out for you the story of Antigone. That thin little creature sitting by herself, staring straight ahead, seeing nothing, is Antigone. She is thinking. She is thinking that the instant I finish telling you who's who and what's what in the play, she will burst forth as the tense, sallow, wilful girl whose family would never take her seriously and who is about to rise up alone against Creon, her uncle, the king. Another thing that she is thinking is this : she is going to die. Antigone is young. She would much rather live than die. But there is no help for it. When your name is Antigone, there is only one part you can play; and she will have to play hers through to the end.

এইভাবে শুরু হচ্ছে জাঁ আনুই-এর 'আন্তিগোনি'। কোনও ভারিক্কি চালে নয়। কোরাসের ছিপছিপে প্রতিবেদন : আন্তিগোনি-র কাহিনি যাঁরা আপনাদের জন্য অভিনয় করে দেখাবেন তাঁরা উপস্থিত মঞ্চে। ওই যে রোগা একরত্তি মেয়েটা কিছুই না দেখে তবু সামনের দিকে তাকিয়ে, একা—ওর নামই আন্তিগোনি। ও ভাবছে। যে-মুহূর্তে এই নাটকের পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার কাজটা শেষ করব আমি, সেই মুহূর্তে ওই সর্বদা উৎকণ্ঠিত, ফ্যাকাশে, একরোখা মেয়েটির ভাবনার বিস্ফোরণ ঘটবে। ওর পরিবারের লোকজন ওকে কখনও বোঝার চেষ্টা করে না। ও একা। এবং একাই ও বিদ্রোহ করবে ওর মামা, রাজা ক্রিয়নের বিরুদ্ধে। ও বসে-বসে এটাই ভাবছে। ও আরও একটা জিনিস ভাবছে। ভাবছে ওকে মরতে হবেই। আন্তিগোনি-র বয়েস নেহাত কম। ও আরও কিছু দিন বাঁচলে পারত। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। তোমার নাম যদি হয় আন্তিগোনি তা হলে তোমার বেরোবার উপায় নেই তোমার নির্দিষ্ট ভূমিকা থেকে। শেষ পর্যন্ত তোমাকে পালন করে যেতেই হবে নিয়তিনির্ধারিত ভূমিকা। নিয়তিপীড়িত চরিত্রের গল্প বলতে ভালবাসেন জাঁ আনুই। তাঁর 'দ্য লার্ক' নাটকের নায়িকা জোয়ান অফ আর্ক। নাটকটির প্রথম লাইন : Well now, is everyone here? If so, let's have the trial and be done with it. The sooner she is found guilty and burned, the better for all concerned. নাটকের প্রথম থেকেই জোয়ান-ও নিয়তিনির্ধারিত মৃত্যুপথের পথিক। যার নাম জোয়ান অফ আর্ক, তার অন্যভাবে বাঁচার উপায় আছে কি?

'আন্তিগোনি' নাটকের শুরুতেই, কোরাসের মাধ্যমে, খুব সহজভাবে গ্রিক পুরাণের গল্পটি বলে দেন আনুই। যাকে বলে ধ্রুপদী সারল্য : রাজা ইদিপাস-এর দুই মেয়ে—আন্তিগোনি আর ইসমিনি। আর দুই ছেলে—ইটোক্লিস এবং পলিনিসেস। ইদিপাস-এর মৃত্যুর পর ঠিক করা হল তাঁর দুই ছেলে ভাগ করে বসবে থিব্‌স-এর সিংহাসনে। এক বছর ইটোক্লিস তো পরের বছর



পলিনিসেস। কিন্তু বড় ছেলে ইটোক্লিস এক বছর রাজত্ব করার পর সিংহাসন ছাড়তে চাইল না। লেগে গেল ছোট ভাই পলিনিসেস-এর সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ। দুই ভাই-ই মারা গেল যুদ্ধে। ফলে হঠাৎ রাজা হয়ে গেল ইদিপাস-এর শ্যালক ক্রিয়ন। যুদ্ধে ইটোক্লিস-কে সমর্থন করেছিল ক্রিয়ন। রাজা হওয়ার পর ফতোয়া জারি করল ক্রিয়ন, ইটোক্লিস-কে সমাধি দেওয়া হবে মহা ধূমধাম করে, আর পলিনিসেস-এর জুটবে না কোনও কবর, কারণ সে ছিল দেশদ্রোহী। তার দেহ পচবে, শকুনে-কুকুরে খাবে, পচা মড়ার গন্ধ ছড়াবে সারা শহরে। আর সেই দেহকে যদি কেউ মাটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে তবে তার শাস্তি মৃত্যু। নাটকে তার ভাইয়ের পচা দেহের ওপর দু'বার মাটি চাপা দিচ্ছে আন্তিগোনি। একবার শাবলে মাটি খুঁড়ে। অন্যবার শাবলের অভাবে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ে-আঁচড়ে। You must have lost your shovel, had to go at it with your fingernails the second time, I'll bet. By god, I never saw such nerve!...There she is, clawing away like a hyena. Right out in broad daylight!...She was clawing away like a wild animal. With the heat haze and everything my pal says, 'That must be a dog.' I say, 'That's a girl!'

আন্তিগোনি শুধু রাজকন্যাই নয়, রাজা ক্রিয়নের ছেলে হিমন-এর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। এক পার্টির রাতে, নাচ গানের মধ্যে নিঃসঙ্গ আন্তিগোনি-কে হিমন বলছে, আমাকে বিয়ে করো আন্তিগোনি। আন্তিগোনি হিমন-এর এই হঠাৎ প্রস্তাবে এতটুকু বিচলিত বা উত্তেজিত হল না। She looked up at him out of those solemn eyes of hers, smiled sort of sadly and said 'yes'. That was all. এই আশ্চর্য নির্লিপ্তির কারণ বুঝতে পারি কিছু পরেই। আন্তিগোনি জানে, কোনওদিন তার বিয়ে হবে না, এ-পৃথিবীতে তার কোনও বর নেই। I shall never, never be able to marry you, never! আন্তিগোনি বলে হিমনকে যখন সে একা তার সঙ্গে। সে জানে তার একমাত্র ভূমিকা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলা। অথচ সে চায় হিমনের স্ত্রী হতে। সে চায় হিমনের ভালবাসা, শরীর। সে চায় বিছানায় হিমনের উত্তাপ : I wanted you to take me; I wanted to be your wife before—I wanted to be your wife last night because I love you that way very very strongly. আন্তিগোনি তো বাঁচতেও চায়। সে জীবনকে ভালবাসে তীব্রভাবে। সে নিজেই বলে তার জীবনকে ভালবাসার কথা : আমি সবার আগে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠি। আমি ভালবাসি আমার শরীরে ভোরবেলার ঠান্ডা বাতাস। আমি ছোটবেলায় কেন অত কাঁদতাম জান? কারণ উপত্যকায় কত ঘাস, মাঠেঘাটে কত প্রাণী, সবাইকে জানার চেনার স্পর্শ করার তো সময় হবে না আমার। এমন তীব্র জীবনপ্রেম, এত গভীর ভালবাসা, তবু আন্তিগোনি জানে তার নিয়তিনির্দিষ্ট পথ এবং এক বিষণ্ণ নির্লিপ্তি কাজ করে তার নিঃসঙ্গ বিদ্রোহের মধ্যেও।

সোফোক্লিস থেকে সরে এসেছেন আনুই তাঁর ট্র্যাজিকবীক্ষণে। আনুই-এর আন্তিগোনি এ-যুগের নায়িকা, যে ব্রেকফাস্ট সারে টোস্ট-মাখন খেয়ে। এবং গ্রিক ট্র্যাজিকবোধ থেকে ভিন্ন আনুই-এর আধুনিক ইউরোপিয়ান ট্র্যাজিক-চেতনা। কোরাস-এর মুখে উচ্চারিত সেই সমকালীন সংজ্ঞা : স্প্রিং-টা গোটানো হয়েছে খুব টাইট করে। ওটা নিজে-নিজেই খুলতে থাকবে। বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডির এটাই স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক ব্যবস্থা। কব্জির সামান্য একটু মোচড়। অমনি কাজটা হয়ে যাবে। যে কোনও একটা কিছু ওটাকে চালু করে দেবে : পথে যেতে-যেতে তুমি দেখলে মেয়েটি হাত উঁচু করে তার চুলে হাত রাখল; কোনওদিন সকালে উঠে ভাবলে আজ তোমার জীবনের কাছ থেকে একটু কিছু বেশি পাওয়া উচিত, হয়তো এক কাপ বেশি কফি; কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে পান করতে-করতে দু-একটি বেশি প্রশ্ন—এই সমস্ত সামান্য ঘটনার যে-কোনও একটি এবং শুরু হয়ে গেল ট্র্যাজেডি। বাকিটা অটোম্যাটিক। তোমার আঙুল তোলার পর্যন্ত দরকার নেই। মেশিনটা সত্যি দারুণ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে তেল দেওয়া এই মেশিন। চলে কোনওরকম ঠোক্কর ছাড়া। মৃত্যু, বিশ্বাসঘাতকতা, দুঃখ পরপর এগিয়ে আসে। আগে আসে ঝড়, কান্না, নৈঃশব্দ্য। সবরকমের নিঃশব্দ নিস্তরঙ্গতা। যেমন শেষ অঙ্কে যখন ঘাতকের কুঠার উঠে আসে মাথার ওপর—সেই স্তব্ধতা। যেমন নাটকের শুরুতে যখন দুই প্রেমিক-প্রেমিকা, উন্মুক্ত তাদের হৃদয়, নিরাবরণ তাদের শরীর, তারা অন্ধকার-করে-দেওয়া ঘরে প্রথম মুখোমুখি একা—সেই বাক্যহীন নীরবতা। যেমন তোমার মধ্যে সেই নিস্তব্ধতা যখন মানুষের জয়ধ্বনি ঘোষণা করছে কে জিতল—যেন তুমি সাউন্ডট্র্যাকহীন সিনেমার ছবির মতো, চারধারে হাঁ-করে আছে অসংখ্য মুখ, অথচ কোনও মুখে কোনও শব্দ নেই। তুমিই জিতেছ। অথচ শুনতে পাচ্ছ না তোমার জয়ধ্বনি, ইতিমধ্যেই তুমি যে পরাজিত—নির্বাসিত, নিঃসঙ্গ তুমি তোমার নৈঃশব্দ্যের মরুভূমিতে।

এই হল ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডির জন্য প্রয়োজন নেই কোনও অতিনাটকের। ট্র্যাজেডির কোনও কিছুই নয় আকস্মিক। সমস্ত পরিণতিই জ্ঞাত। আনুই-এর এই ব্যাখ্যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে কৃষ্ণকথিত গীতা-র কথা : তুমি যাঁদের হত্যা করতে চলেছ অর্জুন, তাঁরা সবাই নিহত। তাঁদের ধ্বংস নিয়ে নতুন করে ভাবনার কিছু নেই। সেই কাজটি তোমার আগে আমিই সেরে রেখেছি। তুমি নিমিত্ত মাত্র। এইখানেই মহাভারতের ট্র্যাজিক মহত্ত্ব। আমরা নিয়তির খাঁচায় আবদ্ধ তবু অর্জুন বা ইদিপাস-এর মতো প্রশ্ন করি আমরা। এবং প্রশ্ন করি বলেই আমাদের অনিবার্য ধ্বংস এবং মৃত্যুও হয়ে ওঠে সুন্দর। ক্রিয়ন যখন বলছেন আন্তিগোনি-কে, যেমন বাপ তেমন মেয়ে, তোর বাপ ইদিপাস-টাও ছিল কুৎসিত, আন্তিগোনি ছোট্ট একটি উত্তর দিচ্ছে : We are of the tribe that asks questions and we ask them to the bitter end. Until no tiniest chance of hope remains to be strangled by our hands...Yes, I am ugly! Father was ugly, too. But Father became beautiful. And do you know when? At the very end. When all his questions had been answered.

সবকিছু হারানোর, অপ্রত্যাশিত সর্বনাশের এই ক্যাথারসিস বা শান্ত্বয়নের ব্যাখ্যা জাঁ আনুই-এর। অপূর্ব মৌলিক।

আন্তিগোনি ● জাঁ আনুই

বিষয় বিচ্ছেদ

মন ভাল লাগছে না, মা।
বিষয়, বিচ্ছেদ।

এ আবার হয় না কি? ওই অমঙ্গুলে শব্দের প্রতি উৎসর্গিত হবে আমাদের রোববারের সকাল, আমাদের ভালো-বাসার বারান্দা? প্রথমেই মনে হল, না, ও শব্দ নাড়াচাড়ার নয়। বড় কড়া শব্দ, আমি বাপু একটু ন্যাকা মতন আছি। অত কঠিন শব্দে আমার অরুচি। শব্দ নিয়েই তো আমাদের বেঁচে থাকা, শব্দের মধ্য দিয়েই তো পৃথিবীর সঙ্গে চেনাশুনো, সব শব্দকে নিয়ে আমি খেলা করতে রাজি নই। অসতর্ক অবস্থায় এক-একটা শব্দ তোমার অন্তরাত্মার ভিতরে গভীর বিনষ্টি ঘটিয়ে দিতে পারে। আমি ভিতু।

বিচ্ছেদ। শব্দটাই কী ভয়ালদর্শন, দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। ছেদন তার শাণিত প্রচণ্ডতা নিয়ে উপস্থিত আছে শব্দটার মধ্যে, একটা শীতল ইস্পাতের কুঠার জাগ্রত আছে। কুঠার, নাকি উদ্যত খড়গ? শিরচ্ছেদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। একটা নিষ্ঠুর শব্দ। শাণিত, রক্তাক্ত শব্দ। বিচ্ছেদ। প্রস্তুতি না থাকলে দীর্ণ বিদীর্ণ করে ফেলতে পারে। কিন্তু প্রস্তুতি কি থাকে?

মা গো, বিচ্ছেদ শব্দের সঙ্গে তুমি জড়িয়ে গেলে কেমন করে? আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে ভিতরে যে বিচ্ছেদের তরঙ্গ ওঠে, মা তুমিই তার সবটা বোঝো। তুমি ছড়িয়ে আছ আমার দশ দিকে, তুমি জড়িয়ে আছ আমাকে, আমার প্রাণবায়ু তুমি। সেই রক্তাক্ত নাড়ির পাক যে কিছুতেই খুলছে না মা। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে দেশ কাল পেরিয়ে, সেই রক্ত এখনও টকটকে লাল, এখনও উষ্ণ, এখনও চটচটে, এখনও ঝরন্ত। মা গো, তাই বুঝি বিচ্ছেদ শব্দ তোমাকেই ডেকে আনল? আমি তো জানি এই একটি জায়গায় বিচ্ছেদের পরাজয়।

বিচ্ছেদ লিখতে বসে অনেকদিন আগের একটা ছবি আসছে মনে। তোমার কাছে একটা খোলা চিঠিতে আমি লিখেছিলুম, মা, দ্যাখো আমি কেমন আছি। মনে পড়ে? সেই ছবিটা আজও তেমনিই অস্থির, তেমনি উড়ন্ত, ভাসন্ত, এই আছে, এই নেই। সেই যে একটা নামহীন দ্বীপের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তোমার মেয়ে, একা, নোনা বাতাসে তার খোলা চুল উড়ছে, চারিদিকে রুপোলি বালির ঢেউ, মধ্যদিনের সূর্যের জ্বলন্ত রোদ ঠিকরে পড়ছে, সেই সাদা বালিতে, মাথার ওপরে ঝনঝন করছে ইস্পাতের তৈরি আকাশ, অনেক দূরে যেতে হবে তোমার মেয়েকে, ওই যেখানে কালচে নীল সমুদ্দুরের ইঙ্গিত, সেইখানে তার জাহাজ আসবে একদিন, মনে আছে তো, মা গো? পার হতে হবে বালিয়াড়ি, রোদে তেতে ওঠা বালি পায়ের নীচে সিসের মতো ভারী, আর ফোস্কা পড়া গরম—

মনে পড়ে, মা, সেই সব দিন?

হ্যাঁ, শব্দেরাও নিষ্ঠুর, মোলায়েম, রুক্ষ, উজ্জ্বল, গোমড়া, হাসিখুশি, নানা রকমের হতে পারে। এইরকম সব শব্দের সঙ্গে আমরা সারাদিন ঘর করি। এক একটা শব্দ হঠাৎ এসে পড়ে কখনও আমাদের মনকেমন করিয়ে দেয়, কখনও মন অন্ধকার হিম, আবার কখনও ঝলমলিয়ে, কুলকুলিয়ে রঙিন ঝরনা বইয়ে দিতে পারে। আর কোনও কোনও শব্দ মুহূর্তের মধ্যে জগৎ বাতাসহীন করে দেয়। 'বিচ্ছেদ' এমনই এক নিদারুণ শব্দ, যে পলক ফেলতে তোমার জগৎ থেকে শেষ জলবিন্দুটুকুও কেড়ে নিতে পারে। 'করাল' বলে একটা দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিশেষণ ছোটবেলা থেকে আমাকে ভয় দেখায়, পারতপক্ষে পছন্দ করি না, বেজায় অমঙ্গুলে আর বিধ্বংসী লাগে শব্দটাকে আমার।



'বিচ্ছেদ' অবিকল তেমনি এক করাল শব্দ। শুনলেই মনে হয়, না না, সইবে না। পারব না, বাঁচব না। কানে আঙুল দিয়ে ওকে আটকাতে হবে। ওই যে, ওই শান দেওয়া কুঠারটা যেন ঝিকমিলিয়ে ওঠে ওর মধ্যে। 'বিচ্ছেদ' শব্দের চোখে আছে জল্লাদের নির্মমতা। এক উদ্ধারবিহীন শেষ।

'বিরহ' কিন্তু তা নয়। বিরহে বেদনা আছে, যন্ত্রণা আছে, আশাহীন নিষ্ঠুরতা নেই। 'বিচ্ছেদ'-এর ঠিক কেন্দ্রে গেরো পাকিয়ে বসে রয়েছে জোরালো একটা যুক্তাক্ষরের জট, সেই জটিলতা 'বিরহ'-এ নেই। বিচ্ছেদ শেষ হয় একটি ব্যঞ্জনবর্ণে। বি-চ্ছে-দ। মুখ বুজে যায় ব্যঞ্জনান্ত শব্দ উচ্চারণের শেষে, দাঁতের সঙ্গে জিভের স্পর্শের পরে অলিখিত হসন্তে দাঁড়ি টানা হয়ে যায়, আর কিছুই বলতে বাকি থাকে না। 'দ' যেন শেষ দরজা বন্ধ করে দেয়।

আর 'বিরহ'? বিরহ আমাদের নরম-সরম স্বরান্ত শব্দ, শব্দটা উচ্চারণের পরেও ঠোঁট দু'টি খোলাই থাকে, থির থির কাঁপতে থাকে, কথা ফুরিয়ে যায় না। দুই শব্দেরই শুরুতে 'বি' থাকলে কী হবে, পরে কিন্তু একেবারে ভিন্ন পন্থা। বিচ্ছেদ-এর যুক্তাক্ষরের জায়গায় বিরহের কেন্দ্রে এসে পড়ছে 'র', একটা মিষ্টি আলতো আধো স্বর-এর আওয়াজ, তার মধ্যে লুকিয়ে বাজনা বেজে ওঠে। আর শেষ হচ্ছে 'হ' দিয়ে, একটা হাহাকারের হাওয়ায়। যেমন ফাগুন হা হা করে ফুলের বনে? বিরহ শব্দের দীর্ঘশ্বাসের শেষে তাই দরজা বন্ধ হয়ে যায় না, মুক্তই থাকে। শেষের হ একটা খোলা হাওয়া বইয়ে দেয়।

এইজন্যে বিরহে বিচ্ছেদ থাকলেও, এবং বিচ্ছেদে বিরহ থাকলেও আমার কানে দু'টো এক শোনায় না, একটা ফাইনাল, বিচ্ছেদ যেন চিতার আগুনের মতো শেষ কথা। চরম।

আর অন্যটাতে চান্স আছে। বিরহের শেষ বুঝি মিলনে। সম্ভাবনাময়।

আমাদের ঠাকুরমশাই সেটাই ভাবতেন, তাই গানে যখন তিনি 'বিচ্ছেদ' শব্দটা আনেন, সুরের দায়ে 'দ'-কে স্বরান্ত করলেও বজ্রনির্ঘোষের মতো শব্দ হয়, আগুনের অক্ষরে বুকের ভিতরে খোদাই হয়, 'অসহ বিচ্ছেদ বেদনা'! আর 'বিরহ' শব্দের বেলাতে? কত সহজেই শব্দটি থেকে চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়ে ভুবন জুড়ে, বসন্তের বাতাস এসে রোমকূপে কাঁপন জাগায়, 'বিরহ মধুর হল আজি' লেখা হয়ে যায়।

কিন্তু 'বিচ্ছেদ'-এর পাশে বসতে তো 'মধুর' শব্দটি রাজি হবে না। কেমন করে হবে?

বিরহের সমাপ্তি মিলনে।

আর সেই মিলনের পরিসমাপ্তি ঘটায় বিচ্ছেদ।

না, 'বিচ্ছেদ' শব্দে আমার অ্যালার্জি, ও অপয়া শব্দ আমার পছন্দ নয়, একেবারেই না।

বিচ্ছেদের মধ্যে যেন নিয়মভঙ্গের রুক্ষতা।

শুষ্ক, শূন্য ঋতুর ফাঁকে ফাঁকে, কালবৈশাখীর পাগলামির পরেও



প্রস্ফুটন আর পরিপূর্ণতার প্রত্যাশা জেগে থাকে বসন্ত আর বর্ষায়। প্রকৃতির স্বভাবে বিরহ আছে, বিচ্ছেদ নেই। কিন্তু বিচ্ছেদ আসে তখনই, যখন সুনামির মতো, কি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠার মতো প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোনও অনিয়ম ঘটে যায়। যেটা হওয়ার নয় সেইটেই এসে ঘটিয়ে ফেলে বিচ্ছেদ। সে নিজেই এক দুর্ঘটনা।

বিচ্ছেদের মধ্যে আছে বিষাদ ছাড়িয়ে ওঠা এক নিরুত্তর কঠোরতা। অংক মেলে না। এই প্রাণময় বিশ্বভুবনে আমি একশোবার বিরহ নেব, বিষাদ নেব, কিন্তু না, বিচ্ছেদ নেব না, নশ্বরতা কেমন যেন নগ্ন, আর অসহায় হয়ে পড়ে বিচ্ছেদের সামনে। কিছুই করার থাকে না।

মা গো, তোমার দুষ্টুকে মনে পড়ে? আমি ছিলুম তোমার একলা ঘরের শিশু, দুষ্টুকে তোমরা আমার সঙ্গের সাথী করে দিয়েছিলে, আমার ছ'বছর বয়েস থেকে আঠারো বছর বয়েস পর্যন্ত একসঙ্গে বড় হয়েছিলুম দু'জনে। তোমার সঙ্গে সেই যেবারে ইশকুল ফাঁকি দিয়ে ইউরোপ বেড়াতে চলে গিয়েছিলুম অনেকগুলো মাসের জন্যে, আমার তখন বারো। সেখানে সবই আশ্চর্য, সবই নতুন, দিনের বেলায় সবই তো ভাল, কিন্তু রাত হলেই কান্না। দুষ্টুর জন্যে মনকেমন আমাকে আঁকড়ে ধরত। রোজ রাত্তিরে আমার বালিশ ভিজে যেত। বুকের মধ্যে কষ্ট। সে আমাকে ভুলে গেল কি? না, না, তারও নিশ্চয়ই এমনিই মনকেমন করছে আমার জন্যে। তাকে তো চিঠি লেখা যায় না, আমার যে এত মনকেমনের কষ্ট, সেটা তাকে জানাব কেমন করে? কবে যে আবার আমাদের দেখা হবে? হবে তো? আমি আকুল হয়ে দিন গুনতুম।

বড় হয়ে টের পেয়েছি ওটারই নাম, 'বিরহ' প্রপার। বিরহের জন্যে রাধাকৃষ্ণ অনিবার্য নন। ওই আকিঞ্চন, ওই অস্থিরতা, ওই কান্না, মাঝে মাঝে ওই কিছু ভাল-না-লাগা-মনখারাপের নামই বিরহ।

আরও ছোটবেলাতে, মা গো, তোমার জন্যে অবিকল ওই 'বিরহ' বোধ হত আমার, তুমি যদি আমাকে বাড়িতে রেখে কিছুক্ষণের জন্যও কোথাও যেতে, আমার বুকের ভেতরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরে পড়ত বিরহ।

অবিশ্যি তারও আগে, যখন আমি খুব ছোট, আমার মনে পড়ে, তোমার কোলে বসে বসেই তোমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে তোমার জন্যে কী ভীষণ মনকেমন করত আমার। সে যে কী বস্তু, সেটার কী যে নাম, কে তা জানে?

তুমি যেদিন আমাকে বাড়িতে রেখে একেবারে চলে গেলে, আমি তখন বড় মেয়ে হয়ে গিয়েছি। নিজেই মা। অথচ কী যে ঘটে গেল তখন, ঠিকঠাক কিছু টেরই পেলুম না যেন।

আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে নেমে এল আঁধার, রেশ কোনওকালে ঘুচে যাওয়ার নয়, যার ঘেরাটোপ আমার চারিপাশে, আমার দৃষ্টিতে, আমার হাসিতে যা ছুঁয়ে থাকে। যা নিয়ে কথা হয় না, তার নাম বিচ্ছেদ।

আর ওই 'বিচ্ছেদ' শব্দ থেকে থেকে জন্ম নিয়ে আমাদের অন্তঃস্থল থেকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছে আর এক বিভীষিকা শব্দ, যে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে মুখোশ পরে। তাকে চেনা যায় না, সে থাকে ধরাছোঁওয়ার বাইরে। তার ভয়ানক মূর্তি চোখে দৃশ্যমান হয় না কখনও, কিন্তু বুকের ভিতরে তার বিধ্বংসী শক্তি সীমাহীন। পরমাণু বোমার মতো সর্বক্ষয়ী, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলে তার তীব্র মারণক্ষমতা। তার নাম 'বিচ্ছিন্নতা'।

হ্যাঁ মা, তুমি তোমার বালিকা বয়সেই, বিচ্ছেদ চেনবার আগেই ভীষণ এক বিচ্ছিন্নতাকে জেনেছিলে, তোমার মতো করে। কিন্তু ঠিক আজকের দিনের এই নতুন হয়ে ওঠা কালনাগিনীর মতো অপ্রতিরোধ্য, ওই সরীসৃপ শব্দটার সঙ্গে তোমার মোটে চেনাশুনো হয়নি গো মা,—ভাগ্যিস হয়নি?

এক এক সময়ে হঠাৎ দেখতে পাই একটা পুরনো চেনা শব্দের মধ্যে কোথা থেকে এমন অচেনা শক্তি, এমনি প্রবল জোর এসে ঢুকে পড়েছে, যে শব্দটা প্রাণে তালা ধরিয়ে দিয়েছে। কিছু দিনের জন্যে প্রাণটা ভোঁ ভোঁ করতে থাকে, কিছু দ্যাখেও না, কিছু শোনেও না, কিছু বোঝেও না। যেন আছে কি নেই সেটাও তার বোধের বাইরে। সারা অস্তিত্বকে স্তিমিত করে দিতে পারে, এইরকম দু'টো একটা দোর্দণ্ডপ্রতাপ শব্দ হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠে আমাদের জীবনে, আর তার পরেই জীবন বাধ্য হয়ে মোড় ঘোরে।

ভালবাসা যেমন।

বিচ্ছেদও এইরকমই এক শব্দ হতে পারে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নয়।

০৬.০২.২০১০

nabaneetadevsen@gmail.com

ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে সত্যি-ই কার্যকরী।
এখন, ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণিত



পৃথিবীতে ডায়াবেটিস এর রাজধানী হল ভারতবর্ষ।
বদলে যাওয়া জীবনযাত্রা এবং খাদ্যাভ্যাসের জন্য আরও বেশী ভারতবাসী ব্লাড সুগারে আক্রান্ত হচ্ছেন।
বৈদ্যনাথ মধুমেহারী, অবশেষে হাতের নাগালেই এক যুগান্তকারী সুরাহা, যা কিনা
ডাক্তারী পরীক্ষায় ৮৩% সফল হিসাবে প্রমাণিত।
ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণিত
রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ডায়াবেটিস রোগীদের উপর পরীক্ষায়, মধুমেহারী ৮৩% কার্যকর বলে প্রমাণিত - যা কিনা ডাক্তারী পরীক্ষার নিরিখে এক যুগান্তকারী ইতিহাস।
সময়ের কষ্টিপাথরে প্রমাণিত ভেষজ
মধুমেহারীতে আছে নিম, করলা প্রভৃতি ১৮টি প্রমাণিত ভেষজ। যা শুধু ব্লাডসুগারই নিয়ন্ত্রণ করে না, প্যানক্রিয়াসকে উদ্দীপিত করে ইনসুলিনের যোগান বাড়িয়ে দেয়।
বৈদ্যনাথ
মধুমেহারী
দানা
নিরাপদ, প্রাকৃতিক এবং কার্যকরী।



অসম্ভব

পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে ভাবিনু মনে
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণীনদীর তরল রব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।।

এমনি রাত্রে কতবার, মোর বাহুতে মাথা,
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে বাঞ্ছিত
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে বৈভব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।।

দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে,
আকাশের সুর বাজিছে শিরায় বৃষ্টিধারে।
যূথীবন হতে বাতাসেতে আসে সুধার স্বাদ,
বেণী-বাঁধনের মালায় পেতেম যে সংবাদ
এই তো জেগেছে নবমালতীর সে সৌরভ—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।।

ভাবনার ভুলে কোথা চলে যাই অন্যমনে
পথসংকেত কত জানায়েছে যে বাতায়নে!
শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান
অশ্রুজলের-আভাসে-জড়িত আমারি গান।
কবিরে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই ১৯৪০ (৩২ আষাঢ় '৪৭)
(পুনর্মুদ্রণ, বানান অপরিবর্তিত)

ছবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জিয়নকাঠির স্পর্শ

আমি বিচ্ছেদের কাছে নতজানু।
আমি বিরহের প্রতি একনিষ্ঠ।

বিরহের মধ্যে রয়ে গেছে 'রহ'।
বিরহ যেন বলছে 'তুমি থাকো।'
বিরহে সে রহে।
মিলনে সে চলে যায়।
Love is nothing but missing.
প্রেম বেঁচে থাকে বিচ্ছেদের বেদনায়।
কাল রাতের বেলায় গান এল মোর মনে,
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে।
কী আশ্চর্য, তোমাকে বলতে চাই যে-কথাটা,
সেই কথাটি বলার জন্য কত না অপেক্ষা আমার, কখন
আসবে সুযোগ-সময়, কথাটি বলার মতো হয়ে সেজে
উঠবে মনে—কিছুতেই সে-কথা বলতে পারি না, যখন
তুমি থাকো আমার সঙ্গে, অথচ সেই কথাটি সুরের
হোমানলে উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে—
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে।
তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল আমার সকালবেলা—
কী রোম্যান্টিক সকাল, যেন মিলনের জন্য মেড টু অর্ডার,
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে, পাখির গানে আকাশ গেল পুরে;—
অথচ তোমার বিরহে যে-কথাটি জ্বলে উঠেছিল সুরের হোমানলে,
সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে
যতই প্রয়াস করি পরাণপণে—
যখন তুমি আছ আমার সনে।

প্রেম-সাহিত্যে মিলনকে ছাপিয়ে উঠেছে বিরহ।
প্রেমের গানে-কাব্যে শুধুই তো প্রেমের আর্তি, ফিরে এসো সুরঞ্জনা,
ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।
গত জুন মাসে সে ছিল আমার সঙ্গে—
মনে হয়েছিল জুন টোয়াইস জুন,
কারণ, শি ব্রিদ্‌ড ইট উইথ মি,
জুনের সুবাসে সে আর আমি এক সঙ্গে নিশ্বাস নিয়েছিলাম,
লিখলেন রবার্ট ব্রাউনিং।
যে মড-গন্'এর প্রেম পাওয়ার জন্য জ্বলে পুড়ে গেল
উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস-এর যৌবন,
তাঁকেই লিখলেন চির-বিচ্ছেদের ওপার থেকে,
শুধু মনে রেখো ওয়ান ম্যান লাভড দ্য পিলগ্রিম-সোল ইন ইউ,
একজন পুরুষ, শুধু একজন, ভালবেসেছিল তোমার তীর্থযাত্রী আত্মাকে—
Love itself is what is left over when being
in love has burned away—
প্রেমে পড়ার জ্বলুনি যখন পুড়ে ছাই হয়ে যায়
তখন পড়ে থাকে সেই নির্যাস যা প্রেম—
কী সুন্দর কথা! কে লিখেছেন মনে নেই।
Love. Of couse, love. Flames for a year,
ashes for thirty.

প্রেম যার আগুন জ্বলে এক বছর,
যার ছাই পড়ে থাকে তিরিশ বছর।
তবু what will survive of us is love,
লিখলেন ইংরেজ কবি ফিলিপ লারকিন,
আমরা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও
বেঁচে থাকবে প্রেম—আমাদের প্রেম।
প্রেম বেঁচে থাকে যে-জিয়নকাঠির স্পর্শে,
তা বিরহ।



যাদের বিয়ে করলাম তীব্র ভালবেসে,
যাদের একান্ত নিজের করে না-পেলে, মনে হয়েছিল,
নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, কিঞ্চিৎ বিচ্ছেদের ব্যথাও
সইতে পারছি না, তারাই যখন ধরা দিল বিয়ের
খাঁচায়, আমিও তাদের সঙ্গে একই খাঁচায়,
পাশ ফিরতেই গায়ে লাগছে ডানার ঝাপটা,
প্রথম-প্রথম কী ভাল! মনে হল এরই নাম সুখ—
কিন্তু কত তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হল ব্যবধানের,
না-হলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে!
কাছে থেকেও দূর রচনা না করতে পারলে প্রেম বাঁচে না—
শিল্পিতভাবে দূর রচনা সবাই করতে পারে না,
করা যায়ও না—হয়তো।
প্রেম নিজে থেকেই তৈরি করে নেয় প্রয়োজনীয় দূরত্ব,
নিজ-নিজ স্বস্তির ব্যবধান।
দেখবেন, অনেকদিনের স্বামী-স্ত্রী—
পরস্পরকে না কি নিবিড়ভাবে ভালবেসেই চলেছেন বছরের
পর বছর!
অথচ পাশাপাশি কখনও হাঁটেন না, স্বামী আগে স্ত্রী পিছনে,
এই হল বিবাহিত প্রেমের পরিচিত চেহারা—
বিচ্ছেদহীন বিরহহীন প্রেমে নৈকট্যের প্রকট অরুচি।
তবু প্রতিরাতে পাশাপাশি শয়ন এঁদের—
না হলে পাশটা খালি-খালি মনে হয়—
বিরহবিহীন প্রেমে এই হল 'অভ্যাস'-এর বশ্যতা।
কবে মরে গেছে প্রেম। রয়ে গেছে জীর্ণ অভ্যাস। দীর্ণ সহবাস।

যাদের ভালবাসলাম, কী বিয়ের মধ্যে, কী বিয়ের
বাইরে—
থাকল না তারা কেউ!
কেন চলে গেল, এ-প্রশ্ন অবান্তর—
তবু এ-প্রশ্নেরও সৎ উত্তর আছে—
নিষ্ঠ হতে পারিনি বলে।
একই নারী বা পুরুষকে ভালবেসে তাকেই শেষ প্রেম
ভেবে নেওয়া—অসম্ভব সে অসম্ভব।
যাঁরা পারেন বা পেরেছেন বলে মনে করছেন—
তাঁরা সাহস বা সুযোগের অভাবে একনিষ্ঠ,
এবং এই তঞ্চক চরিত্রবানতার আড়ালে তাঁরা





ক্রমাগত নিজেদের ঠকাতে-ঠকাতে এবং দগ্ধ
হতে-হতে নিঃসাড় হয়ে গেছেন। তাঁদের প্রেমজীবন,
সেক্সজীবন ইন ডিপ কোমা।
আসলে তাঁরা জুড়িয়ে গেছেন
নকল নিষ্ঠতায়। বেশ আছেন তাঁরা। ভাল থাকুন।
আমার জীবনে এমন ঘটেনি—
কিছুতেই পারিনি একনিষ্ঠতায় সমর্পিত হতে, চিরমিলনে
জুড়িয়ে যেতে—
প্রেমের উত্তেজনা, রোমান্স, গনগনে আঁচ বাঁচিয়ে রাখতেই
প্রেমে পড়েছি বারবার—
যখন সে চলে গেছে এবং আসেনি অন্য কেউ,
কী ভয়ঙ্কর সেই একাকিত্ব—
মনে হয়েছে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা করাত দিয়ে কাটছে—
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।
হঠাৎ আবার অন্য হাসি, অন্য কণ্ঠস্বর, অন্য চাউনি,
চাহিদা ও দানের ভঙ্গিটি ভিন্ন!
ক্রমশ পেলব হয়েছে বিচ্ছেদের ব্যথা—
ক্রমশ তীব্র হয়েছে মিলনের সুখ—
ক্রমশ মনে হয়েছে এই শেষ প্রেম, শেষ নারী।
তারপর দেখা দিয়েছে সেই পুরনো অসুখ—
কখনও আমি, কখনও সে—চেয়েছি দূরত্ব, ব্যবধান, বিচ্ছেদ।
এমনও হয়েছে আমি ভালবাসছি, অথচ তার
ভালবাসা থেমে গেছে অলীক সংলাপের মতো—
যেন কোনওদিনই কিছু বলেনি সে—
সবটাই যেন আমার মনের ভুল!
এমনকী ঠোঁটে ঠোঁট, স্তনে স্পর্শ,
শরীর জুড়ে ঢেউ—
সব থেমে গেছে হঠাৎ দুপুরে—
বলেছে চললাম, আর কোনওদিন এইভাবে পাবে না আমাকে!
কেন? ছোট্ট এই প্রশ্নটি করতে পারিনি।
কী লাভ ওই কেন-র উত্তর জেনে?
প্রেম মানে তো শুধু ধরে রাখা নয়। প্রেম মানে ছেড়ে দেওয়া,
ছেড়ে যাওয়া।
এবং প্রেম মানে ছেড়ে-যাওয়া-ছেড়ে-দেওয়াকে নীরবে
মেনে নেওয়া। প্রেমের সবচেয়ে বড় রোমান্স এই সমর্পণে।

প্রেম বেঁচে থাকে মিলনের স্মৃতিতে। মনে পড়ে, খুব মনে পড়ে। একাকিত্বের বড় সম্পদ মিলনের স্মৃতি। সবে এম.এ পাশ করে পড়াতে শুরু করেছি কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে। তার ছিল অলটারনেটিভ ইংলিশ। ক্লাসে শুধুই সে। অচিরে ক্লাস চলে গেল গঙ্গার ধারে। আমার তেইশ বছরের হাত তার আঠেরো বছরের হাত ধরেছিল কোনও সূর্যাস্তবেলায় কৃষ্ণনগরের গঙ্গার ধারে। কিছুদিনের মধ্যেই তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। ভারি মিষ্টি দেখতে ছিল তাকে। সে কলেজ ছেড়ে দিল। এখনও মনে আছে কী কষ্ট পেতাম একা গঙ্গার ধারে বসে থাকতে। তবু যেতাম। কষ্ট পেতে ভাল লাগত বলে। হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গেলাম কলকাতার এলগিন রোডে ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ-এ। কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে এলাম কলকাতায়। এবং প্রেমে পড়লাম এক বিবাহিতা সহকর্মীর। এক সময়ে বিয়ে করলাম। তাকে নয়। অন্য এক বন্ধুনিকে। মনে হল জীবনের কাছ থেকে শেষ পাওয়া পেয়ে গিয়েছি। অথচ বিয়ের বিছানায় প্রেম ঘুমিয়ে পড়ল ক্রমশ। ভিন্ন প্রেম হঠাৎ এল এক বর্ষার বিকেলে। সে আর আমি পাশাপাশি হাঁটছি লাল ছাতার তলায়। দু'জনেরই আদ্দেক ভিজছে। বেশ লাগছে আমার তার স্লিভলেস ভেজা দেখতে। এরকম যদি সারাজীবন ভিজতে পারতাম আমরা—যদি এমন কোনও বর্ষা আসে যেদিন সে থাকবে না আমার সঙ্গে?

বিয়ে করবে আমাকে? না বলে পারলাম না। তোমাকে! কী করে? তুমি তো অন্যের স্বামী। তাতে কী? এক স্ত্রী থেকে অন্য স্ত্রীর কাছে যাওয়া কি যায় না? জানি। অনেক সময় লাগবে। তবু বলো অপেক্ষা করবে।

অনেক বছরের প্রেমের পর বিয়ে করলাম তাকে। কিন্তু আবার শুরু হল দূরত্ব। আবার দেখলাম প্রেম ঘুমিয়ে পড়ে মিলনের বিছানায়। আবার বিচ্ছেদ!

প্রেম সর্বদা চায় নতুনের উত্তেজনা। আবিষ্কারের আনন্দ। পুরানোকে ছেড়ে যাওয়ার মধ্যেই বেঁচে থাকে ভালবাসা। কোনও বিশেষ সম্পর্কে প্রেমের পক্ষে আটকে থাকা সম্ভব নয়। চিরদিনের প্রেম বলে কিছু নেই। যা চিরদিনের তা একনিষ্ঠ প্রেমের স্বপ্ন। জীবনের যতবার প্রেমে পড়েছি মনে হয়েছে এ-প্রেম চিরদিনের। কোনওদিন মৃত্যু হবে না এই ভালবাসার। যত কাছে গিয়েছি প্রেম মরেছে। তার। কিংবা আমার।

তবু প্রেম আছে। মনে পড়ায়। বিরহে-বিচ্ছেদে-বেদনায় থেকে গিয়েছে প্রেম।

ক্রমশ বেদনাও পাণ্ডুর। বিচ্ছেদের ব্যথা অসাড়। শুধু জেগে আছে একটি অনুভব—ভাগ্যিস কারও সঙ্গে সম্ভব হয়নি চিরদিনের সম্পর্ক।

আমার জীবনে সব প্রেম বিরহে একাকার। আমি বিচ্ছেদের কাছে নতজানু, কৃতজ্ঞতায়।



পূর্বভারতের সর্ববৃহৎ ডায়াবেটিস এবং মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল
সমস্ত রোগমুক্তির নতুন ঠিকানা
প্রতিশ্রুতি বিশ্বমানের পরিষেবা
একই ছাদের নীচে সব রোগের নিরাময়
যে-কোনো অসুখে, ১০০ টাকায় বিশেষজ্ঞদের বিশদ পরামর্শ (সকাল ৮ থেকে দুপুর ২)
সেরা সি. টি. অ্যাঞ্জিও মেশিনের সার্বিক সুবিধাযুক্ত অত্যাধুনিক প্যাথোলজি (রিপোর্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে)
দিনরাত অবিরত ইমারজেন্সি, সবসময় ফার্মাসি
স্পেশালিটি ক্লিনিক্স- ডায়াবেটিস, হার্ট, অ্যাজমা, চক্ষু পরীক্ষা সহ সামগ্রিক চিকিৎসা
রেডিয়োলজি, ইমেজিং পরিসেবা, সি টি স্ক্যান কালার ডপলার, এম আর আই সহ আধুনিক ক্যাথল্যাবরেটরির পরিষেবা
কর্পোরেট, সিনিয়র সিটিজেন এবং সন্নিহিত প্রতিবেশীদের জন্য বিশেষ সুবিধা
অঙ্গীকার সেবার আদর্শ, কম খরচে ভালো চিকিৎসা।
Care for Life
আপনার সুস্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
জি ডি ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউট অ্যান্ড স্পেশালিটি ক্লিনিক্স প্রা. লি.
১৫০ শয্যা এবং বহুমুখী পরিষেবা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক হাসপাতাল
১৩৯এ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০ ০১৩ ফোনঃ ০৩৩-২২২৫৫০৩০/৩১/৩২/৩৩
ফ্যাক্স: ০৩৩-২২২৫১১১৫ E-mail: gddi502@gmail.com, gddi502@bsnl.com

চিঠির বাক্স

যে জানলার কোনও দেশ নেই। দায় নেই। বিদায়ও।

—আছেন না কি? পিং...পিং...
—হুঁ, আছি তো, বলুন।
—কী আর বলি, এমনি টোকা দিলাম। দেখলাম জানলায় আছেন, তাই।
—বেশ করলেন। তা পরশু আপনার ফ্লাইট ক'টায় যেন?
—সাড়ে চারটে। ভোর।
—হুঁ।
—চুপ করে গেলেন যে? ব্যস্ত? পিং... পিং...
—নাহ, ইশুকে ওষুধ খাওয়াচ্ছিলাম।
—ও।
—প্যাকিং শেষ?
—ওই আর কী। আমি তো পারি না তেমন, বৈশালী দেখে দিয়েছে।
—খুব যত্ন করেন আপনার। না?
—কে? বৈশালী?
—হুঁ।
—তা করে। একটাই তো বর। আপনিও তো করেন। করেন না?
—আপনার হাতঘড়ি আছে?
—এড়িয়ে গেলেন তো? বেশ...
—বোকার মতো প্রশ্ন করলাম। ধুর। হাতঘড়ি থাকবে না আপনার? ধুর!
—আছে। কিন্তু নেইও আবার।
—মানে?
—মানে আছে বেশ কয়েকটা, কিন্তু সেই যে কলেজ আমলে ঘড়ি পরা ছেড়েছি, এখনও পরি না। কেমন একটা অস্বস্তি হয়।
—ও। তা হলে সময় বোঝেন কী করে?
—সেলফোন আছে তো। ওটা ছেড়ে থাকতে পারি না।
—দেখেছেন, আবার একটা বোকার মতো প্রশ্ন। আমি না...
—হুঁ। আপনি বেশ বোকাই।...পিং...পিং...আছেন?
—সরি, একটু উঠেছিলাম।
—আপনি কি সেই ছোট থেকেই এত রাত অবদি জাগেন?
—কে জানে, এখন আর মনে পড়ে না।
—বাড়িতেও জাগতেন? মানে বিয়ের আগে?
—হুঁ, তা জাগতাম। তখন অবশ্য বই পড়তে পড়তেই ভোর হয়ে যেত। আপনি?
—আমি খুব রিসেন্টলি শুরু করেছি।
—বৈশালী রাগ করেন না?
—ও এ-সব ব্যাপারে খুব আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ইনফ্যাক্ট...
—জানেন, ছোটবেলায় না, আমার একটা চিঠির বাক্স ছিল। এমনি এমনি।
—মানে?
—একটা কীসের যেন বাক্স বাবার আলমারি থেকে লুকিয়ে নিয়ে এসে রংচং মাখিয়ে চিঠির বাক্স তৈরি করেছিলাম। ওপরে লিখেও রেখেছিলাম 'আমার চিঠির বাক্স'। ভেবেছিলাম আমি যখন বাবার মতো বড় অফিসার হব, আমারও দেশ-বিদেশ থেকে রোজ একগাদা চিঠি আসবে, এই বাক্সে সেগুলো গুছিয়ে রাখব। সব চিঠি যে পড়ার সময় পাব, তা তো না, কারণ তখন আমি রীতিমতো ব্যস্ত, সারাদিন এ-অফিস থেকে ও-অফিস দৌড়ে বেড়াচ্ছি বাবার মতোই, কিন্তু তাই বলে চিঠিগুলো ফেলে দেওয়াও যাবে না, তাই যত্ন করে ওই বাক্সেই গুছিয়ে রাখব সব চিঠি। পরে যদি কখনও সময়-টময় হয় তো পড়ে দেখব, দরকার



হলে উত্তরও দেব এক-আধটার, এইসব ভাবতাম জানেন, কী যাচ্ছেতাই ছেলেমানুষ টাইপ ছিলাম, না?

—তারপর?

—তারপর আর কী, আমার ছোট্ট খাটের তলায় অনেকদিন রাখা ছিল বাক্সটা।

—তারপর?

—তারপর যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি, এখানে চলে এলাম পাকাপাকি। চিঠির বাক্সটা ফেলে এলাম। এখানে আসার পর প্রথম ক'দিন খুব কেঁদেছিলাম, জানেন? চিঠি তো ছিল না একটাও বাক্সে, কিন্তু বাক্সটার জন্যেই খুব মনখারাপ হয়েছিল। বাবা কত নতুন-নতুন বাক্স এনে দিল, আমার মন উঠল না কিছুতেই। সেই থেকে আর কোনও দিন চিঠির জন্যে বাক্স বানাইনি।

—সেই বাক্সটার কী হল, জানতে ইচ্ছে করেনি?

—করে তো, এখনও করে। কিন্তু উপায় কী! আমরা তো বাংলোয় থাকতাম, অফিসার'স বাংলো। আমরা উঠে আসার পর অন্য কোনও অফিসার তাঁর পরিবার নিয়ে এসে থাকতে শুরু করেছেন, তারপর অন্য কোনও অফিসার। এইভাবে কত কত লোকজন থেকে গিয়েছে সেই বাংলোয়, এখনও থাকছে নিশ্চয়ই। একটা সামান্য বাক্স, সে কি আর আছে?

—তা হলে বাক্সটা কোথায় গেল, ভেবেছেন কখনও?

—হুঁ, ভাবি তো। এখনও ভাবি।

—কী ভাবেন? বলবেন?

—ভাবি যে আমাদের দেখতে না-পেয়ে বাক্সটা একদিন নিজেই বেরিয়ে পড়ল পুরনো সেই বাংলো ছেড়ে, হাওয়ায় ঝড়ে ওলটপালট খেতে খেতে পৌঁছল কোনও এক বরফের দেশে। আমার মতো বাক্সেরও বয়েস বেড়ে গিয়েছে এতদিনে। বরফ-ঢাকা একটা রাস্তার ধারে মেপ্‌ল গাছের ভারী ছায়ায় সে পড়ে রইল বছরের পর বছর। তার গায়ে এসে জমতে লাগল বরফ...

—আর?

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়



—আর আমার নামের যত চিঠি, সব এসে জমা হতে লাগল ওই বাক্সে। দেশ থেকে, বিদেশ থেকে, কত-কত রংবেরং খামে একের পর এক চিঠি এসে জমা হতে লাগল। সব যে একেবারে ভীষণ গুরুগম্ভীর কাজের চিঠি, তা হয়তো নয়, দূরে-দূরে চলে যাওয়া বন্ধুবান্ধবের চিঠিও আছে অনেক, সেইসব এসে জমা হতে লাগল ওই ছোট্ট বাক্সটায়। এখনও হচ্ছে। এই আমি যখন কথা বলছি আপনার সঙ্গে, ঠিক তক্ষুনি, জানি আমি, কোনও না কোনও চিঠি এসে ঠান্ডায় জবুথবু হয়ে ঢুকে পড়ছে আমার রং করা বাক্সটায়।

—এ সব আপনি দেখতে পান?

—পাই তো। চোখ বন্ধ করলেই বাক্সটাকে দেখতে পাই আমি।

—আপনি কিন্তু খুব ভাল লিখতে পারেন। লেখেন না কেন?

—কে বলল, লিখি না?

—লেখেন? কই, এতদিনে একবারও দেখাননি তো!

—আপনার কী ধারণা? সব লেখা দেখা যায়?

—মানে?

—বাদ দিন। আমার আপশোসটার কথা তো বলাই হল না।

—কী আপশোস?

—বাহ্। ওই বাক্সটায় এই এত বছর ধরে এতগুলো চিঠি জমা পড়ল, একটাও তো পড়া হল না আমার। কে আমাকে কবে কী কথা লিখে পাঠাল, জানাই হল না। বাক্সটাকে ঘিরে, এই এত বছর ধরে বরফ পড়ল কেবল...

—হুঁ।

—কী হুঁ? আপনি বরফ দেখেছেন? দুধসাদা, থোকা-থোকা বরফ?

—এখনও দেখিনি। তবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই দেখব। ওখানে এখন স্নো হচ্ছে, খবর পেলাম।

—হুঁ। ক'টায় যেন ফ্লাইটটা আপনার?

—বললাম যে, ভোর সাড়ে চারটে?

—দেখেছেন, আজকাল কিচ্ছু মনে রাখতে পারি না। বুড়ি হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, আপনি আর ফিরবেন না?

—বলা মুশকিল। আমাদের ফিল্ডে এই ব্যাপারগুলো এত আনপ্রেডিক্টেব্‌ল, দেখি।

—একা-একা থাকবেন তো। পারবেন? এখানে তো বউ না থাকলে অন্ধকার দেখেন।

—তা দেখি। তবে মাস দুয়েকে বৈশালীও আমাকে জয়েন করবে।

—আর বাবানের স্কুল?

—ওখানে ভর্তি করিয়ে নেব। আপাতত উপায় তো নেই আর। ক'বছরের মামলা কে জানে!

—হুঁ। তা হলে তো বেশ সুখেই থাকবেন মশাই। বউ-ছেলে নিয়ে বিদেশে...দিব্যি।

—শুনতে ওরকম মনে হয়।

—না না, নতুন নতুন বন্ধু হবে আপনার, পুরনোদের কথা তখন মনেই পড়বে না।

—অত সহজ না কি ভুলে যাওয়া?

—অতই সহজ। আমি দেখেছি।

—কী দেখেছেন?

—দেখেছি, চোখের আড়াল তো মনের আড়াল।

—হুঁ। শুতে যাবেন না?

—এখন কী?

—আচ্ছা, এই যে আপনি এত রাত অবদি জেগে থাকেন, কথা বলেন আমার সঙ্গে...

—দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। শুধু আপনার সঙ্গেই কথা বলি ভাবছেন কেন? আরও বন্ধু তো থাকতে পারে আমার? আছেও তো। তাদের সঙ্গেও তো একই সময়ে কথা বলতে পারি! কি, পারি না?

—উঁহু, পারেন না।

—বাপ রে! কী কনফিডেন্স! কেন পারি না শুনি?

—কারণ আপনার এই আজগুবি বকবক কেউ রাত জেগে শুনবে না। আমি বলেই শুনছি। তাও আবার এত বছর ধরে।

—বেশ। টা টা।

—আরে, কী হল, শুনছেন? পিং...পিং...পিং...আছেন?

—বলুন।

—দুম করে এত রেগে যান কেন বলুন তো?

—সকলের মতো করে ভাবতে পারি না। তাই বলে আপনিও খোঁটা দেবেন?

—খোঁটা দেওয়া হল ওটা? বাদ দিন।

—বেশ, বাদই দিলাম তা হলে। দু'দিন পরেই উড়ে যাবেন, এত রাগারাগি করে লাভ নেই।

—হুম, শুনলেই মনে হচ্ছে দু'দিন পর থেকে অনেক কিছু পাল্টে যাবে আমার।

—তা তো যাবেই।

—যাবেই, না?

—ও মা, যাবে না? আপনি দেশ ছেড়ে কে জানে কদ্দিনের জন্যে অচেনা একটা দেশে, অচেনা শহরে, অচেনা লোকজনের মধ্যে চলে যাচ্ছেন, পাল্টাবে না?

—বৈশালী আর বাবান তো যাবে।

—তা যাবে, কিন্তু ওদের জন্যেও তো এটা মারাত্মক একটা বদল। তাই না?

—হুঁ, এভাবে ভেবে দেখিনি।

—দেখুন তা হলে। তবে কেবল আপনার, মানে আপনাদেরই অনেক কিছু পাল্টে যাবে, এরকম ভাবার কারণ নেই কিন্তু।

—মানে?

—মানে আরও অনেকের অনেক কিছু পাল্টে যেতে পারে। বুঝলেন মশাই?

—ও।

—ধুর, আপনাকে কিছু বলাই বৃথা।

—আপনি কি ভাবলেন আপনার কথাটা বুঝলাম না?

—বুঝলেন? বাহ্। খুব ভাল। তা বুঝে হলটা কী?

—যদি বলি হল, তা হলে?

—তা হলে বলবেন। কত লোকে তো কত কিছু বলে, সে-সব নিয়ে মাথা ঘামালে আমার চলবে?

—আচ্ছা, এবার অন্তত একটা ছবি কি দেখতে পারি আপনার? মেল করবেন আমাকে?

—উঁহু।

—এটুকু বন্ধুত্বও কি হয়নি?

—তা তো বলিনি। কিন্তু বন্ধুত্বের সঙ্গে ছবির কী সম্পর্ক?

—হয়তো কিছু না। কিন্তু তিন বছর ধরে প্রায় রোজ রাতে যার সঙ্গে কথা বলছি, আড্ডা দিচ্ছি, ভাল-লাগা খারাপ-লাগা ভাগ করে নিচ্ছি, তাকে কেমন দেখতে, এটা জানতে ইচ্ছে করবে না?

—করবে হয়তো। কিন্তু সব ইচ্ছে কি বাস্তব হয়?

—আচ্ছা বেশ। আমার ছবি, পাঠাই একটা?

—নাহ্, আমি কি চেয়েছি?

—না-ই বা চাইলেন, ধরুন আমার ইচ্ছে করছে আপনি আমাকে দেখুন।

—আমার ইচ্ছে করছে না যে। সবসময় ছবি দিয়েই দেখতে হবে কেন? আপনার কেন মনে হয় যে সব লেখাই পড়া যায়, সব ছবিই দেখা যায়, সব গানই শোনা যায়? কেন মনে হয় আপনার?

—মাঝে মাঝে কী যে বলেন, আমি কিছু বুঝি না।

—দরকার নেই তো বোঝার। এই যে ভাবছেন সব কথাই বুঝে নিতে হবে, না-বুঝলে শান্তি পাচ্ছেন না, এই ভাবনাটা থেকে এবার বেরিয়ে আসুন প্লিজ।

—আচ্ছা বেশ। বুঝলাম না, দেখলামও না। কিন্তু বাইরে গিয়ে,



কখনও যদি মনে হয় কথা বলি, কী করব তখন? আপনার ফোন নম্বরটা দেবেন না?

—কী হবে নিয়ে? কল করবেন? কী বলবেন কল করে? কেমন আছি জানতে চাইবেন?

—এত রুড হচ্ছেন কেন?

—রুড হলাম কোথায়, প্রেডিক্ট করছি। তিন বছর ধরে দিব্যি তো কথা বলছি আমরা। ফোন নম্বর লাগেনি তো। কারওরই লাগেনি কারও নম্বর। এখন হঠাৎ চাইছেন কেন?

—সিম্পল। চলে যাচ্ছি বলে।

—বুঝুন। একটা মজার কথা আপনার এখনও মাথায় আসেনি, না?

—এর মধ্যে আবার মজার কথা পেলেন কোথায়?

—ও মা! সব কিছুর মধ্যেই তো কোনও না কোনও মজার কথা লুকিয়ে থাকে।

—বেশ, মেনে নিলাম। তা এখানে মজার কথাটা কী?

—মজার কথাটা হল এই যে, আপনি তো দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, ধরে নিলাম অনেক দিনের জন্যেই যাচ্ছেন। কী, তাই তো?

—হুঁ।

—কিন্তু তাতে তো আমাদের কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, তাই না?

—মানে?

—ওহো, আমার-আপনার এই তিন বছরের যোগাযোগের মধ্যে কোথাও তো দেশ নেই। কোনও ভৌগোলিক স্থায়ী ঠিকানা নেই, যেখানে আপনার খোঁজ করে আর পাব না আমি। এরকম ব্যাপার তো নেই। দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াও নেই তাই। আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া, কথা বলা, ভাল-লাগা খারাপ-লাগা ভাগ করে নেওয়া, সবটুকুই তো এই জানলায়। আর পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে এই জানলা একইভাবে খোলা যায়। অতএব আপনি দেশে থাকুন বা বিদেশে, অ্যাট লিস্ট আমার তো কিচ্ছু যায় আসে না। বুঝলেন এবার?

—বুঝলাম। মানে আপনার মোটেই মনখারাপ করছে না। তাই তো?

—খামোকা মনখারাপ করতে যাবে কেন? আপনার সঙ্গে কি রোজ সামনাসামনি দেখা হয় নাকি আমার, যে, দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলে কান্নাকাটি করব? দেখা তো হয় এই জানলায়, সে তখনও হবে।

—আপনি কিন্তু খুব রুড।

—আপনাদের এই এক ঝামেলা। ন্যাকামি বাদ দিয়ে সোজাভাবে কথা বললেই সেটা রুড হয়ে যায়। যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখবেন একবার। আমার মনখারাপ হওয়ার কোনও কারণ আছে কি না। বুঝলেন?

—বেশ, বলছেন যখন, ভেবে দেখব।

—আচ্ছা, আমার কথা বাদ দিন। আপনার হচ্ছে, মনখারাপ?

—হবে না? কে জানে কতদিনের জন্যে দেশ ছেড়ে যেতে হচ্ছে।

—এই আরেক স্বভাব আপনাদের। কথা ঘোরাবেন না। বেশ, সোজাসুজি জিগ্যেস করছি। এই যে আমি দেশেই থেকে যাচ্ছি, আপনি সপরিবারে বিদেশ যাচ্ছেন, এই জন্যে আপনার কি মনখারাপ হচ্ছে? (খুব নির্লজ্জের মতো বললাম, না? কী করব, নইলে আপনি বোঝেন না যে!)

—সত্যি কথা বলব?

—আপনার মিথ্যে শোনার জন্যে এত রাত অবদি জাগছি না কিন্তু আমি।

—খুব মনখারাপ হবে।

—ও মা! সে কী? কেন?

—কারণটা খুব সহজ। আপনি এতক্ষণ ভেবে দেখেননি।

—কী কারণ, শুনি?

—এই যে বলছিলেন, আমাদের আড্ডার কোনও দেশ নেই, বিদেশ নেই, ব্যাপারটা এতটাও সোজা না। আমাদের দিনরাতের হিসেবটা উল্টে যাবে, সেটা ভেবেছেন?

—মানে?

—মানে এই যে রোজ রাত হলেই আড্ডা, সেটা আর এভাবে হবে না। এরপর আপনার রাত মানে আমার সকাল, তখন আমি প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকব, আর আমার রাত মানে আপনার সকাল, আপনি তখন সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বুঝলেন?

—ও!

—তাই বলছিলাম যদি, ছবি না হলেও ফোন নম্বরটা অ্যাট লিস্ট...কোথায় গেলেন? আছেন? পিং পিং পিং...আছেন...?

—আমার একটা কাজ করে দেবেন?

—উফ, আবার আপনার সেই এড়িয়ে যাওয়া।

—এড়িয়ে যাচ্ছি না। ছবি চাইছিলেন না? ছবি দেব। একটা কাজ করে দেবেন?

—ছবির বদলে?

—এভাবে ভাববেন না।

—বেশ, বলুন, কী কাজ।

—আপনি ঠিকানা পেয়ে গিয়েছেন, ও-দেশের?

—হুঁ, গতকালই পেয়েছি। পাঠাচ্ছি, কপি করে নিন—

—না না, ঠিকানা চাই না আমার। ঠিকানা চাইনি।

—তা হলে?

—এটা বাড়ি তো একটা? আপনি যেখানে থাকবেন, বাড়ি তো?

—হুঁ, থ্রি বেডরুম কটেজ একটা। একটু আউটস্কার্ট-এ। কেন?

—আপনার সেই বাড়ির কাছাকাছি বরফ পড়ছে এখন?

—শুনলাম তো সেরকমই।

—তা হলে এক কাজ করবেন। কোনও একটা ছুটির দুপুরে ভাল করে গরম জামাকাপড় চাপিয়ে নিয়ে বেরবেন। বাড়ি থেকে

বেরিয়ে হাঁটা শুরু করবেন। সঙ্গে টর্চ রাখবেন একটা, বলা তো যায় না, ফিরতে যদি সন্ধে হয়ে যায়, নতুন জায়গা, কী থেকে কী বিপদ হয়ে যাবে, তখন আবার আমাকে দুষবেন। দোষ দিতে তো জুড়ি নেই আপনার। তো, বেরিয়ে হাঁটতে থাকবেন। সোজা রাস্তায় মিনিট সাতেক হাঁটার পর দেখবেন ডানদিকে একটা ছোট্ট রাস্তা বেঁকে গিয়েছে, অতটা পাকা নয়, একটু উঁচু-নিচু, কিন্তু বরফ পড়ে আছে তো, উঁচু-নিচুটা আর টের পাবেন না। ওই সরু রাস্তাটায় হাঁটতে থাকবেন নাক বরাবর। একটু পরে রাস্তাটা বেশ ঢালু হয়ে দেখবেন বাঁদিকে নেমে গিয়েছে। নেমে যাবেন। আর বেশিক্ষণ না, মিনিট দশেকের হাঁটা। হাঁটা শুনে ভয় পাচ্ছেন তো? উপায় নেই। তৈরি থাকুন। ও রাস্তায় গাড়ি যায় না। তো সেই ঢালু রাস্তায় মিনিট দশেক নেমেই দেখবেন ছোট্ট একটা নদী। বিখ্যাত নয় মোটেই, কেউ নামও শোনেনি তেমন, তবু, বছরে সাত মাস জল তিরতির করে যখন, নদী তো বলতেই হবে তাকে। আপনি অবশ্য নদী বলে বুঝতে পারবেন না, বরফ জমে সে তখন কাঠ। তাতে আকাশের আবছা ছায়াও দেখা যাচ্ছে। আপনি করবেন কী, নদীটা পেরিয়ে যাবেন। সাবধানে পেরবেন কিন্তু, খুব বেশি চাপ দিলে বরফের আয়না ভেঙে হিমজলে হাবুডুবু। অবধারিত নিউমোনিয়া, বউ আসতে আরও দেড় মাস। তো ছোট্ট সেই জমাট বাঁধা নদীটা পেরিয়ে দেখবেন একধারসে মেপ্‌ল গাছের সারি। গাছের পাতায় পাতায় ভারী বরফ জমে নুয়ে পড়েছে, কখনও-সখনও ঝুপ করে খসেও পড়ছে বরফ। যত দূর চোখ যায়, দেখবেন, একের পর এক মেপ্‌ল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে কোথায় পাখি ডাকছে। বিদেশি পাখি। তার ডাক কি আপনি চেনেন? চিনে নেবেন তখন। ওই মেপ্‌ল-এর সারি বরাবর ষাট-সত্তর পা হেঁটে দাঁড়াবেন। জানি, হাঁপিয়ে যাবেন ততক্ষণে, তাড়া নেই কোনও। একটু দাঁড়ান, ব্যাকপ্যাক থেকে বোতল বের করে জল খেয়ে নিন, আর সিগারেট তো খাবেনই, তখন তো কেউ বারণ করার থাকবে না। তা খেলেন না হয় একটা, তারপর কোনও একটা গাছের কাছাকাছি বরফ সরিয়ে দেখবেন, সাত বছরের বাচ্চার রংচঙে আঁকিবুঁকি কাটা একখানা বাক্স রয়েছে। একেবারে পেয়ে যাবেন বলছি না, অতদিন আগেকার ব্যাপার, একটু খুঁজে দেখতে হতে পারে। আমার জন্যে এটুকু তো করবেন, না কি? বাক্সটা ততদিনে আরও একটু বুড়োটে হয়ে যাবে, গায়ের রং চটে যাবে আরও একটুখানি, ঠান্ডা হয়ে যাবে তার শরীর। তাতে কিছু না। আস্তে করে বাক্সের ঢাকনা সরিয়ে দেখবেন, একেবারে নীচের দিকে একটা ছবি আছে। ছোট্ট একটা মেয়ে ফুলছাপ ফ্রক পরে হাতে একটা কমলালেবু নিয়ে পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা-কালো। ওটাই আমি। বুঝলেন?

—হুঁ।

—কী বুঝলেন, শুনি একবার?

—বুঝে নিয়েছি। চিন্তা নেই। ঠিক খুঁজে বার করব। কিন্তু বাক্সটা খুলব কী করে? আপনার চিঠির বাক্স, তার পাসওয়ার্ড জানি আমি?

—এই তো। আপনিও দেখতে পাচ্ছেন তা হলে। আর পাসওয়ার্ড নিয়ে ভাববেন না। বরফের ওপর পড়ে থাকা যে কোনও একটা হলুদ হয়ে যাওয়া মেপ্‌ল পাতা তুলে নিয়ে বাক্সটার গায়ে বুলিয়ে দেবেন একবার—বাক্স খুলে যাবে। ওটাই পাসওয়ার্ড। সলভ করে দিলাম তো আপনার প্রবলেম? ছবি পেয়ে গেলেন তা হলে?

—তা তো পেয়ে গেলাম। কিন্তু এই যে এত-এত বছর ধরে সেই বরফচাপা বাক্সে আপনার নামে একের পর এক চিঠি জমা পড়ছে, সেগুলোর কী হবে?

—হুম। আরেকটু খাটাব আপনাকে। স্নিকার দিয়ে দু'একবার চাপ দিলেই দেখবেন, ছোট্ট সেই জমাট নদীটার গায়ে ফাটল ধরেছে। হাত দিয়ে বরফের পাত সরিয়ে দিলেই নীচে কনকনে নীল জল। ভাসিয়ে দেবেন বরং চিঠিগুলো। বাক্স-সমেত।

—খারাপ লাগবে না আপনার?

—ও মা, খারাপ লাগতে যাবে কেন। ওরাও একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিতে পারবে।

—চিঠিগুলো দরকার নেই আপনার? পড়ে দেখবেন না?

—উঁহু।

—বেশ, তাই দেব তা হলে।

—হ্যাঁ, তাই দেবেন।

—আরেকটা কথা।

—বলুন।

—এত খেটেখুটে সাত বছরের মেয়েটাকে যে খুঁজে বার করব আমি, তাকে বলবটা কী?

—হুম্‌ম...বলবেন...বলবেন সে যেন এবার নিজের ইচ্ছেমতো বড় হয়ে ওঠে। সে যেন নাচের স্কুলে যেতে ইচ্ছে না-করলে না যায়, যেন গরমকালের দুপুরে টো-টো করে বেড়াতে ইচ্ছে করলে সেটাই করে, বলবেন এবার সে যেন কাউকে ভয় না-পায়, বাবা মা দাদা দিদি বন্ধুবান্ধব কাউকে না। বলবেন সে যেন বড় হয়ে যা হতে ইচ্ছে করে, তা-ই হয়। সে যেন আর কারও জন্যে নিজের ইচ্ছেগুলোর দম আটকে মেরে না-ফ্যালে, সে যেন অন্যরকম একজন মানুষ হয়। কী, বলবেন তো?

—হুঁ, বলব। কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন ছিল।

—বলুন, এবার আমাকেও উঠতে হবে, ইশুর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

—তা হলে আজ আসুন।

—না না, আপনি বলে নিন। ওর বাবা তো আছে, তেমন হলে ডাকবে আমাকে।

—যদি শেষমেশ না পাই চিঠির বাক্সটা?

—না-ই পেতে পারেন। যদি বিশ্বাস না করেন, পাবেন না। কক্ষনও পাবেন না। আর যদি বিশ্বাস করেন, একটু কষ্ট করে খুঁজলে কোনও না কোনও বরফঢাকা মেপ্‌ল গাছের নীচে ঠিক পাবেন ওকে। আমি জানি।

—আপনি সত্যি জানেন?

—সত্যি জানি।

—বেশ। এবার আসুন। ভাল থাকবেন।

—আপনিও।

—পরে কখনও জানলায় হুট করে দেখা হয়ে গেলে কথা হবে।

—হুম। কথা হবে।

—আসি তা হলে?

—আসুন। ওহো...একটা কথা। আপনার ফ্লাইট যেন ক'টায়?

—সাড়ে চারটে। ভোর।

—বেশ। জেগে থাকব আমি।

—জানি।

—আপনি সব জানেন দেখছি। আর কী জানেন শুনি?

—বলব?

—ঝটপট বলুন। এবার সত্যি শুতে যাব।

—জানি যে ফুলছাপ ফ্রক পরা একটা সাত বছরের মেয়ের খুব ঠান্ডা লাগছে কোথাও, তাকে চাদরে মুড়ে জড়িয়ে ধরার জন্যে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি।

—হুম।

—আসি তা হলে এবার। সত্যি সত্যি। ভাল থাকবেন।

—আসুন। ভাল থাকবেন, আপনিও।

—রাত করিয়ে দিলাম আপনার, তাই না?

—এ-সব নিয়ে ভাববেন না। যার জন্যে দেশ ছেড়ে এত দূরে যাচ্ছেন, সাত বছরের সেই মেয়েটার বরফলাগা পাড়ায় এখন সকাল হচ্ছে, এটা ভাবুন। ভাল থাকুন। খুব। টাটা। ও হ্যাঁ, খুঁজে পেলে ছোট্ট সেই মেয়েটাকে বলবেন, খুব মিস করি ওকে আমি। এবার সত্যি সত্যি টাটা।

—বলব। টাটা।

বিচ্ছেদ ▲ শিলাজিৎ

হরিণ বা ট্রেনের গল্প

প্রেমকে ডাকব, বিচ্ছেদকেও। কিন্তু নিজেদের ধরনে, সাহেবদের টুকে নয়।

বিদেশে কোনও এক শহরে মানুষ বড় বিড়াল ভালবাসত। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ড্রয়িংরুমের সোফা জাঁকিয়ে বসে থাকত আয়েসি পোষ্য বিড়াল। বাড়ির মহিলা এবং বাচ্চারা তাদের আদর করত শুধু নয়, আগলে রাখত সারাক্ষণ। চোখের বাইরে হতে দিত না। সেই শহরে গাড়িচালকরা একটু সাবধানেই গাড়ি চালাত খেয়াল করে। যদি কখনও কোনও বিড়াল দৌড়ে রাস্তা পেরোত, তা হলে চালক গাড়ি থামিয়ে দিত এই ভয়ে যে, হয়তো ওর পিছনে বিড়ালের মনিবরাও দৌড়ে আসছে। অর্থাৎ, বিড়াল দেখলেই স্পিড কমিয়ে দাও। সাবধান হও। প্রয়োজনে থামিয়ে দাও বাবা, নয়তো বিড়ালের জন্য হন্যে হয়ে দৌড়ে আসা কোনও মানুষ হয়তো চাকার তলায় পড়ে যাবে। ফালতু অ্যাক্সিডেন্ট, মিথ্যে অশান্তি।

এই অভ্যেস ক'টা বিড়ালকে বাঁচিয়েছিল সে-পরিসংখ্যান জানা নেই। তবে কলকাতায় বিড়াল দেখলে গাড়িচালকরা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষেন, তাতে পিছনের গাড়ি যে তার পিছনে গোঁত্তা মারতে পারে, সে চিন্তা করেন না। উল্টে নানারকম ক্রিয়াকাণ্ড করতে থাকেন, কেউ একটু ব্যাকগিয়ার দিয়ে গাড়িটা পিছিয়ে নিয়ে গাড়ি বন্ধ করে আবার স্টার্ট দেন। কেউ-কেউ আবার উইন্ডস্ক্রিনের ওপর আঙুল দিয়ে কাটাকুটি করেন। কত কী, কারণ বিড়াল রাস্তা পার হওয়াটা নাকি ভীষণ অমঙ্গলের।

সাহেবরা কেন বিড়াল দেখে গাড়ির স্পিড কমিয়েছে প্রশ্ন না-করে আমরা মেনে নিয়েছি যে, ওরাও যখন থামায় আমাদেরও থামানো উচিত। সাহেব মালটা দেখতে better, better ভাষায় কথা বলে—সুতরাং আমার থেকে better বুদ্ধি: সুতরাং ও থেমেছে মানে আমারও থামা উচিত। অতএব থেমে যাও। সাহেবেরা যা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিবার চাহিতেও পরম প্রয়োজন তাহা মানিয়া চলা, মানাইয়া চলো—প্রয়োজনে কিছুটা বানাইয়া বলো—বাকিটা ডুডল্স।

তা সেই শহরে এবার বারোয়ারি ভ্যালেন্টাইন পুজো হতে চলল বলে। পচাদা আটটা কার্ড নিয়ে ঘুরছে। আটটায় আটরকম ডিজাইন। আটরকমের ক্যাপশন। বক্তব্য এক, একদম বুম্বাদার গলায় 'আমি তোমাকে ভালবাসি'। আর চম্পা শম্পা ঋতুপর্ণা সোমদত্তারা উদ্বেল। কে ক'টা কার্ড পেল তার কম্পিটিশন চলছে। HAPPY VALENTINES DAY। কে বে?

কে এই ভ্যালেন্টাইন? কোথায় থাকে কী খায়? বাবার নাম কী? ক'টা কেস আছে? যমুনা চেনে মালটা? গড়িয়াহাট দেখেছে? ঘুগনি খায়—কাঁচালঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে, নিদেনপক্ষে নৌকা আছে একটাও?

আমি জানি না মাইরি।

কী লেভেলের প্রেমিক জানি না গুরু, খবর রাখি না, গোটা বিশ্বের প্রেমের আইকন হয়ে গোয়াবাগানেও পৌঁছে গিয়েছে যখন, তখন ওস্তাদ লোক বলেই মনে হয়, তার প্রেমের মাহাত্ম্য আমি সিরিয়াসলি জানি না, তার গৌরবগাথার সঙ্গে আমি পরিচিত নই, তবে ন্যাপাদাকে চিনি, আর ন্যাপাদার প্রেমের তরিকা দেখলে ওই ভ্যালেনটাইন না কী যেন নাম—ছিটকে সাতশো ছত্রিশ হয়ে যাবে।

পাঁচ-ছ'টা বাড়ির দূর ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে—অন্য বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো চুলবুলির সঙ্গে sign language-এ যেভাবে প্রেম করত ন্যাপাদা—ভ্যালেনটাইন যদি দেখত, তা হলে ওই দেশের গ্রিটিংস কার্ডগুলো কেটে HAPPY ন্যাপাদা'স DAY লিখে দিত। আমরা একটু লালটু মাল দেখলেই better মনে করি, আমাদের পাড়া-প্রেমিকদের খবর রাখি না, পাত্তা দেওয়া দূরে থাক।

কেষ্ট ঠাকুরের প্রেমের ছক না হয় ছেড়ে দিলাম। অদ্দূর যেতে হবে না। ন্যাপাদার একটা ছোট্ট ছক বললেই মালুম হবে। আমাদের পাড়ার এক রাজকুমারের প্রেমিকাকে বাড়ির লোক আটকে রেখেছে, জানতে পেরে যে সে প্রেম করছে। রাক্ষসের প্রাইমারি কর্তব্য রাজকন্যাকে আটকে রাখা। তা আমাদের পাড়ার রাজপুত্র সোনার কাঠি জোগাড় করতে হিমসিম। তখন মোবাইলের যুগ নয় যে তিনটে মিস্ড-কল করে সিগন্যাল পাঠাবে। গাবদা কালো টেলিফোন থাকে বাবা-মায়ের নাকের ডগায়। ফোন ধরা বারণ, সাংঘাতিক সিকিউরিটি। কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন সোর্স থেকে আসা খবর অনুযায়ী শুধু এটুকু জানা গিয়েছে যে, রাজকন্যাকে মামারবাড়ি ট্রান্সফার করা হয়েছে। বাকিটা অজানা, রাজকুমারের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখ সারাক্ষণই লাল থাকছে। কখনও কান্নায় কখনও গাঁজায়। মামারবাড়িটা কোথায় সেটা জানা নেই, রাজকুমার প্রেমে পড়ার আগে-পরে এটুকু জেনে উঠতে পারেনি বেচারা। কীভাবে উদ্ধার হবে রাজকন্যা?

ন্যাপাদা জিগ্যেস করল—'ছিটকিনিদের বাড়িতে ফোন আছে? ফোন নম্বর জানিস।' রাজকুমারের চোখে যেন জ্যোতি ফিরে এল, বলল 'হ্যাঁ'। ন্যাপাদা বলল একটা ট্যাক্সি ডাক। আমরা হতভম্ব। বাড়ির টেলিফোন নম্বর, এর সঙ্গে ট্যাক্সি ডাকার ইকুয়েশন-টা বুঝতে-বুঝতেই ন্যাপাদা রাজকুমারের থেকে ফোন নম্বর নিয়ে পাড়ার ওষুধের দোকানে। ট্যাক্সি রেডি। ন্যাপাদা ছিটকিনির বাড়িতে ফোন করে খুব উত্তেজিত গলায় বলল, 'ছিটকিনি সুইসাইড করেছে—পাড়ার থেকে বলছি। ইমিডিয়েটলি চলে আসুন।' ব্যস এইটুকুই। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে ছিটকিনিদের বাড়ির কাছাকাছি নজর রাখা। কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্‌ভ্রান্ত মাসিমা, মেসোমশাই ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল। আর পিছনে ন্যাপাদা অ্যান্ড বাহিনী। ফলো করতে করতে এসে পৌঁছলাম আমরা ছিটকিনির মামারবাড়ির গোড়ায়। তারপর মেসোমশাই মাসিমা মেয়েকে সুস্থ দেখে আশ্বস্ত হলেন বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মামারবাড়ির নিশ্চিন্ত পাহারা থেকে ছিটকিনি উধাও হয়ে গেল ওই পাড়ারই কিছু পরিচিত পরোপকারীর সহায়তায়। তারপর রাজপুত্র-রাজকন্যা সুখে না-অসুখে কাটাল সে খবর জানা নেই। সে হয়তো গড়পড়তা বাঙালির প্রেমের পরিণতিরই কাহিনি। কিন্তু ন্যাপাদা গড়পড়তা জিনিস নয় গুরু। ভ্যালেনটাইন'কে একটু ভাবতে হবে, চাপ আছে। এরকম ন্যাপাদাতে আমাদের এ-দেশ ভর্তি, তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করাটা আমি আমার কর্তব্য মনে করি। তাতে হয়তো অনেকে নাক সিঁটকোতে পারেন। কিন্তু আমার তাতে ইয়ে, আর তুলনা করা না-হয় ছেড়েই দিলাম। এই দিনক্ষণ মেনে প্রেম নিবেদনের ঢপের কীর্তনটাও আমি ঠিক মেনে নিতে পারি না। তিথি-নক্ষত্র গণনা করে পুজো হতে

পারে—আগের থেকে ডেট ঠিক করে বাংলা বন্‌ধও হতেই পারে। কিন্তু প্রেম হয় না।

সব প্রেম নিবেদন করা যায় না।

সে তুমি যতই ছেঁড়ো গোলাপ ফুল, যতই কেনো সাংঘাতিক সুগন্ধি, যতই লেখো অক্ষরের পর অক্ষর—প্রেম ধরা দেয় না।

প্রেমটা পরিণতি নয়, প্রেম একটা জার্নি।

প্রেম সরকারি চাকরি নয়, প্রেমে জয়েন করা যায় না। Resignation-ও দেওয়া যায় না।

শুধু মাত্র মনে-মনে আপন কোণে একা-একা প্রেম হয় না। প্রেম পেশেন্স খেলা নয়।

তিনশো তেষট্টি দিন গ্রীষ্ম-বর্ষা পেরিয়ে, হঠাৎ শীতের শেষাশেষি একটা আফটার শেভ কিনে একটা গ্রিটিংস কার্ড-এ নিজের নাম সই করে প্রেম হয় না রাখালদা। প্রেম একটা তারিখ নয়।

তুমি জানো না একটা অনামী স্টেশনে মাঝরাতে চুপি-চুপি ট্রেন থামে, প্রেম আসে, আবার চলেও যায়। প্রেম দাঁড়ায় না, প্রেম অপেক্ষা করে না রাখালদা। একটা গোটা বছর অপেক্ষা করে গোটা কয়েক দেশিবিদেশি ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াটা প্রেম নয়, ওটা ওদের প্রেম হতে পারে আমাদের নয়, আমার তো নয়ই। চারতলা বাড়ির ওপর থেকে একটা কাগজের চিরকুট পালকের মতো ভাসতে-ভাসতে ট্রামলাইন-এ পড়ব পড়ব করেও আটকে গেল দু-নম্বর ট্রামের টিকিতে, দৌড়, দৌড়, প্রেম রানিং ট্রাম-এ ঝুঁকি নিয়ে উঠে পড়া রাখালদা, চরতলার ওপর থেকে পড়া সে চিরকুট তখন বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছে। জল আর কালি সাদা কাগজের ওপরে বিচিত্র এক নকশা এঁকে দিয়েছে। সে-নকশায় কোনও তারিখ নেই, সেই দুর্বোধ্য নকশা—সেই গলে যাওয়া সাদা-কালো আঁচড়ে কোনও ভাষা নেই, কোনও বোঝা নেই। অস্পষ্ট অথচ রঙিন সেই চিরকুট তালুর মধ্যে রুমালের মতো নিয়ে তার ধুলো গন্ধ আঘ্রাণ হল প্রেম। প্রেম কর্পোরেশন-এর কলে জল আসা নয় রাখালদা। টাইম মেপে প্রেম হয় না।

আগে থেকে অ্যালার্ম সেট করে নির্দিষ্ট সময়ে ধড়মড় করে উঠে বসে প্রেম হয় না। প্রেমের অ্যালার্ম হঠাৎ বাজে, জেগে থাকলেও বাজে, প্রেমের নিজের নিয়মে বাজে, ভরদুপুরে বাজে, আচমকা কলিং বেল, আর দরজা খুলে যাকে পাবে তার টাই-এর নট-টা ঠিক বাঁধা থাকে না, নড়বড়ে, টলটলে, অবিন্যস্ত, এলোমেলো, লাবডুপ লাবডুপ করে, ছন্দে-ছন্দে নিয়ম মেনে হৃদপিণ্ডের অঙ্কে প্রেম নেই রাখালদা, প্রেম হৃদঘটিত নয়। হৃদয় দিয়ে প্রেম হয় না, প্রেম হৃদয়ে থাকে না, প্রেম আরও নীচে থাকে। লিভারে বা লিভারের নীচেও হতে পারে। হৃদপিণ্ড প্রেমের খবর জানান দিতে পারে অস্বাভাবিক ছন্দে, কিন্তু হৃদপিণ্ড প্রেমের সোর্স হতে পারে না। সর্ষেখেত, শীতের মিঠে দুপুর, বনের পুকুরের পাশে শালের জঙ্গলে একটার-পর-একটা শুকনো শালপাতা প্রেমের মতো শব্দ করে বৃষ্টির মতো ঝরে যাচ্ছে, কেউ একটা কুড়িয়ে নিচ্ছে সেই ঝরে যাওয়া পাতাগুলো। বাঁশের ঝুড়িতে ভরে নিচ্ছে শুকনো শালপাতা, একা-একা গুনগুন করছে, আর ঝুড়িতে পরম আদরে তুলে নিচ্ছে সে, বাড়ি ফিরে সাঁঝবেলায় ওই ঝরা পাতা আগুন জ্বালাবে উঠোনে, প্রেমে আগুন জ্বলে রাখালদা। হঠাৎ জ্বলে। আবার হঠাৎ নিভেও যায়। তুমি জানো না—সারা দুপুর দারুণ আদরে জ্বালানি সঞ্চয় করে সে আগুন আচমকা জ্বলে ওঠে সাঁঝবেলায়। বা গভীর রাতে, বা রাতের গভীরে বা হয়তো জ্বলে না। তুমি সে খবর রাখো না। তুমি কিছু জানো না রাখালদা, কিচ্ছু জানো না, তুমি একটা গাড়ল।

আলোচ্য অংশে রাখালদা কে? এই প্রশ্নটা একদমই ইমপর্ট্যান্ট নয়। সামনের ছত্রিশ বছরেও কোনও পরীক্ষাতেই এ প্রশ্ন আসবে না। পাশ কাটান। আমিও কাটালাম, আমি এ-ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু একটা ট্রেন কিংবা একটা হরিণের কথা বলতে



চাইছি, সেটা ছুটে চলেছে, ছুটছে, ছুটেই যাচ্ছে। আপন আনন্দে, দেশ, কাল, পার্টি অফিস, পথ অবরোধ, তেপান্তর, সব পেরিয়ে ছুটেই যাচ্ছে হরিণটা। দুরন্ত গতিতে সাংঘাতিক খিদে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে জাস্ট বেরোতে হবে বলে। অন্য কোনও কারণে নয়, একের পর এক স্টেশন পেরিয়ে যায় ট্রেনটা। আবার কখনও দাঁড়িয়ে পড়ে কোনও অচেনা অনামী স্টেশনের টিমটিমে প্লাটফর্ম-এ। অথবা মাঝপথে ভীষণ দুপুরে স্নিগ্ধ একটা পুকুরপাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে নিজের খেয়ালে। তারপর আবার ছুটতে থাকে অন্য কোনও পথে।

সেই হরিণটার সঙ্গে আমার দেখা হয়, দেখা হবে, তার গায়ের বুনো গন্ধ আমি মাঝেমধ্যেই পাই। অনেক দূরে, অনেক অনেক দূরে, এখনও অনেকটা পথ বাকি থেকে যাবে। সেই পথের কোথাও হয়তো কেউ বিড়াল দেখলে—গাড়ি থামিয়ে উইন্ডস্ক্রিনে কাটাকুটি করে নিজের ভাগ্য ফেরাবে। বিড়ালটা বেঁচে-বর্তে রাস্তা পেরোবে ন'টা জীবন intact নিয়ে। কিছু মানুষ গ্রিটিংস কার্ড কিনবে বেছে-বেছে। পছন্দের কিছু ছাপা শব্দ কিনে প্রেম নিবেদন করবে সাহেব অবতার-এর জন্মদিনে।

আমি বসে-বসে ভাবি এ-লেখাটার কি কোনও দরকার ছিল, হাজার বাতেলার শেষে আবার এ-জীবনের কিছু অভ্যেসকে প্রেম



বলে বুঝিব, না কি প্রেমকেই অভ্যেস করব। যে পথেই যাই বারবার বুঝি, প্রেম কী? প্রেম কেন? প্রেম কোথায়? এ-সবের থেকেও জোরালো হয় একটাই বাক্য। 'প্রেমটা বড় জরুরি জাঁহাপনা।' সে যেভাবেই আসুক, যদি একটা দিন উৎসব পালন করলে প্রেমের স্বাস্থ্য ভাল থাকে—তাই হোক। প্রেম না-বাঁচলে আমরাও যে বাঁচব না।

কিন্তু

একটা বিরাট 'কিন্তু' ঝুলে রইল, বড় বেশি বলে ফেললাম প্রেম নিয়ে, প্রেমের উৎসব নিয়ে—প্রেমযাপন নিয়ে কিছু বেফালতু শব্দ গেল খরচা হয়ে। তা হোক, এই পৃথিবীর সমস্ত ঝরনার জলের স্নিগ্ধতায় স্নান তো সবার হয় না। অজস্র ঝরনার কোটি কোটি জলবিন্দু কোথায় কোথায় আছড়ে পড়ে, কোথায় যে বিলীন হয়ে যায়, তার হিসেব ভ্যালেন্টাইন বা ন্যাপাদা—কেউ রাখে না। এ পৃথিবী মনে রাখে? পৃথিবী শুধু প্রাচীন হয়। চলন্ত ট্রেনের জানলা থেকে হাত বাড়িয়ে প্লাটফর্মে দৌড়ে যাওয়া হাতের আঙুলগুলো শেষ লহমার স্পর্শটুকু নিয়ে হারিয়ে যায় কোথায়। কত কার্ড, কত ফুল, কত শব্দ, কত নিশ্বাস, কত ছোঁয়া পড়ে থাকে একা-একা। নিঃসঙ্গ চাপা কিছু যন্ত্রণা নিয়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় কত কবিতা। পড়া হয় না।

জানি না, কারা ঠিক করেন কোনদিন কীসের জন্য উদ্‌যাপন হবে। কীভাবে, কী কায়দায় উদ্‌যাপনে সেই দিনের সার্থকতা থাকবে। তবে যে-ফুলগুলো অনাদরে পড়ে থাকবে, যে-শব্দগুলো কারও মনে-শরীরে না ঝাপটা মেরে শুয়ে থাকবে সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে, যে-চিরকুটগুলো কোনওদিন পৌঁছবে না কোথাও, বিচ্ছেদের যন্ত্রণা নিয়ে আস্তে-আস্তে ঢুকে যাবে এ প্রাচীন পৃথিবীর সর্বগ্রাসী পেটে—সেই বিচ্ছেদের জন্য আরেকটা দিন বাছা হোক না।

না-হয় সেটা একজন লাল চামড়ার সাহেবের নামেই হোক, গোটা বিশ্বব্যাপী তুমুল ব্যবসা হোক—কিছু মানুষ, কিছু আহত প্রাণ, কিছু না-পাওয়া যন্ত্রণার চর্চা হোক একটা দিন। সেই বিচ্ছেদ দিবসের ভিড় থেকে একে-একে দুই হয়ে আবার একটা সিন তো শুরু হতে পারে।

না কি থাক!

বিচ্ছেদ পড়ে থাক তার সাংঘাতিক বিষণ্ণতা নিয়ে। তার দিকে তাকিয়ে আমরা প্রেমকে আপাদমস্তক বোঝার চেষ্টা করব। কিছু তো একটা করতে হবে, নাকি!

নইলে আর আগুন কোথায় পাব?

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচ্ছেদ ▲ বিদিশা চট্টোপাধ্যায়

ভিতরঘরের চারামণি

কারশেডে দাঁড়িয়ে থাকে দুখী চুপচাপ ট্রেন। অন্যের বাগানে আলো দেয় নিজের চারাগাছ। ধীরে ধীরে কষ্টের সঙ্গেও বিচ্ছেদ হয়ে যায়।



বিচ্ছেদ আর যুক্ত থাকার মধ্যের তফাতটা একটা হেঁয়ালির মতো। যেটা আমার কাছে সবসময় পরিষ্কার নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে চলে গিয়েও আছে। সেই থাকাটা হয়তো নিজের স্মৃতির কাছে ফিরে যাওয়া। কিন্তু বারবার পিছন ঘুরে তাকানো কি একপ্রকার যুক্ত থাকা নয়? যখন মনে হয় বাসের জানলার পাশের সিটটা ফাঁকা। যখন সারাদিন পর মনে হয় তার কথার কাছে ফিরি, যখন ঘুমোতে যাওয়ার আগে ঘন-ঘন মোবাইল স্ক্রিনে দেখে নিই তার নামটা ভাসছে কি না—তখন কি জোর দিয়ে বলা যায়—ভুলে গিয়েছি। সে নেই হয়ে থাকতে শুরু করলে একটা অসুবিধে হয়। আমরা তখন জোর দিয়ে বলি, নাহ্! আর মনে পড়ে না সেই প্রিয়মুখ, তাকে ভেবে আর রাত জাগতে হয় না এখন, তার ফোনের অপেক্ষায় থাকি না আর। বারবার বলি, যাতে নিজেকে অন্তত বিশ্বাস করাতে পারি। সকালে ঘুম থেকে উঠে শুরু হয়ে যায় তাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য যা-যা করতে হয়। শ্যাডো প্র্যাকটিস করার মতো নিজেকে বারবার বলতে হয় একার জন্য একা থাকাই ভাল, একার জন্য একা ছাড়া কেউ নেই, কেউ থাকে না। একটার পর একটা হার্ডল পেরোতে হয় হাসিমুখে। স্মার্টলি সব পরীক্ষায় বসতে হয়। নিজেকে ঢাকো, নিজেকে ঢাকো যাতে কিছুতেই না কেউ টের পায়। কিছুতেই যেন তোমার নড়বড়ে থাকাটা ধরা না পড়ে যায়। তবু যদি হঠাৎ একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তখন বলি ভাল আছি। গলা স্বাভাবিক রেখে জিগ্যেস করি, তোমার সব ভাল তো? তারপর যেই শেষবারের মতো দেখা শেষ হয়ে যায় তখন গলার কাছে কী যেন একটা কথা আটকে যায়। এক্সকিউজ মি বলে ওয়াশরুমে গিয়ে মুখে জল দিই। নাহ্! এবার সব ঠিক আছে। এবার আর ভুল হবে না। এরপর থেকে আর গলা কাঁপবে না। মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিই তার নামটা। ডিলিট করে দিই অনেক এসএমএস। কিন্তু নম্বরটা তো মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, সেটা বোধহয় আর ভোলা যাবে না। পথ চলতে-চলতে ভাবি, কেউ কি ধরে ফেলল? মুখে কি তার চলে যাওয়ার ছায়া রয়ে গিয়েছে? চোখের পাতায় কি আবার ছলছল করছে সেই হারিয়ে যাওয়া প্রেম? ইস! কেউ যেন দেখে না ফ্যালে। যে চলে গিয়েছে তাকেও বুঝতে দিতে চাই না। এমন অবস্থায় যদি বলি—এখন সব কাটাকুটি, এখন সব হিসেব করা শেষ, এখন আর কিছু পড়ে নেই, তখন নিজেকেও বিশ্বাস করানো একটু মুশকিল হয়। ছিঁড়ে ফেলতে চাইলেই তো আর ছিঁড়ে ফেলা যায় না। এতদিন ধরে একটা সম্পর্ক থাকত আমার ভিতরঘরে, সে নতুন ঠিকানা খুঁজে নিলে পুরনো বাড়িটা তো আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভুলতে পারে না। ফাঁকা ঘরগুলোয় হাওয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আনমনে ভাবে সে হয়তো ফিরে আসবে একদিন। পুরনো সম্পর্ক কেমন দুরারোগ্য ব্যাধির মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখতে চায়। কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে দিতে চায় না। আসলে সে তো আমার চারাগাছ। সেই চারাগাছকে এত বছর ধরে বুকের মধ্যে পালন করা। সময়ে সময়ে তাকে জল দিয়েছি। আদর দিয়েছি। যত্ন দিয়েছি। সে মাথা তুলে একটু একটু করে বেড়ে উঠল চোখের সামনে। বৃষ্টি হলে মাথায় ছাতা ধরেছি, বেশি রোদে শুকিয়ে এলে ছায়ায় এনে রেখেছি। পোকা ধরলে, ওষুধ দিয়ে আমার ফুলমণিকে সুস্থ করে তুলেছি।

একটা-দু'টো ফুল ফুটলে মহানন্দে হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছি। যেদিন গাছটা সবুজ পাতায় ঘন হয়ে ফুলে-ফুলে ভরে গিয়েছে সেদিন অন্য লোক এসে চারাগাছ সমেত টবটাকে নিয়ে চলে গেল। তারপর থেকে তার বাগান আলো করত আমার ফুলমণি, আমার চারাগাছ। সে দু'টো-একটা করে ফুল ছিঁড়ে নিত। মটমট আওয়াজ হত। আমি দেখতাম। তখনও কি বলতে পেরেছি ওটা আমার গাছ নয়! সে নিয়ে গেল বলেই কি আমারটা আর আমার রইল না। যতই দূরে থাকুক আমার চারাগাছ, যতই বিচ্ছেদে কাটুক প্রতিটা দিন, তবু কী প্রবলভাবে যুক্ত হয়ে থাকা, পড়ে থাকা দু-একটা ফুলের পাপড়ির কাছে, বইয়ের পাতায় গুঁজে রাখা শুকিয়ে কালচে হয়ে যাওয়া সেই গাছের পাতার কাছে। কালচে তো নয়, এ যেন রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার মতো একটা গভীর ব্যথার জায়গা। সেই ব্যথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। কেউ নেই যে বরফ চেপে ধরবে। চিনচিনে ব্যথা একটানা হয়েই চলে। তারপর অসাড় হয়ে যায় একদিন। বইয়ের পাতায় সাবধানে রাখি আমার শুকনো পাতা। যাতে আঙুলের স্পর্শে ব্যথা না পায়। ভেঙে গুঁড়িয়ে না যায়। যেটুকু আমার কাছে, সেইটুকুনকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। পুরনো চিঠির কাছে ফিরে





যাই। অ্যালবাম বের করে আনি, আলমারি থেকে। এক-একটা অ্যালবাম। এক-একটা অধ্যায়। অলস দুপুর, ধানের খেত, দিকশূন্যপুর, হঠাৎ বিকেল, আকাশ খোলা ছাদ আর আমার চারাগাছ। হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেই গন্ধটা। আমার চেনা এক পারফিউমের গন্ধ। সেই গন্ধটা আজকাল আর বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। আমি গন্ধটা পেয়ে যাই অনেক অনেকদিনের আগেকার হারিয়ে যাওয়া কমলা রঙের পাঞ্জাবি থেকে। একটা কমলা রঙের বিকেলও রাখা আছে আমার। পুরনো চিঠি ঘেঁটে সেটাকেও বের করে আনি। একটু অবাক লাগে, তা হলে যে ভেবেছিলাম সব কিছু থেকে আমি বিচ্ছিন্ন, সেটার কী হল? আমার ফাঁকা বাগানে আমি একা হয়েও পুরোপুরি একা নই কেন! বিচ্ছেদ হয়েও কেন শেষ হয় না সম্পর্ক! এ আরেক অস্বস্তির কারণ। এটাকে বিচ্ছেদই বা বলি কী করে!

কফি শপের ছেলেটাও এরকম একটা হারানো-প্রাপ্তির খবর শুনিয়েছিল। একটা ফাঁকা বিকেলবেলায়। সেদিন পার্ক স্ট্রিট আলো ঝলমল। ক্যাফে-তে আমার মুখোমুখি ছিল শুধু ধোঁয়া ওঠা কাপুচিনো। কারও জন্য অপেক্ষা নেই। কাচের দরজা ঠেলে কেউ ঢুকবে না। সেদিন আলাপ হয় ওর সঙ্গে। মিষ্টি হেসে জিগ্যেস করত, আমি কেমন আছি। এটা শুনতে খুব ভাল লাগত। এটা শুনতেই যেন বারবার যাওয়া। একদিন গিয়ে ওকে পেলাম না। পরদিনও এল না। ওর সঙ্গীরা বলল, অসুস্থ। বেশ কয়েকদিন পর কাজে এল। দেখে মনে হয়েছিল আগের মতো হাসিখুশি ভাবটা নেই। জিগ্যেস করায় ও বলেছিল, 'মেয়েটা ইউ কে ফিরে গিয়েছে।' সেই মেয়েটার নাম ছিল পদ্মলক্ষ্মী। দুপুর দিকে আসত। ছেলেটার সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল। রোজ আসত মেয়েটা। প্রথম দিকে বন্ধুদের সঙ্গে, পরের দিকে একা। বকরবকর করত ছেলেটার সঙ্গে। 'এই দ্যাখো ওর ছবি তুলেছিলাম মোবাইলে',—মেয়েটার ছবি দেখায় ছেলেটা। ছবি দেখে বললাম, 'খুব মিষ্টি দেখতে তোমার পদ্মকে।' ছেলেটা হেসে বলল, 'আমি আগে জানতাম না ও এখানে থাকে না। যেদিন প্রোপোজ করলাম সেদিন মেয়েটা বলে কিনা ওরা কালই চলে যাচ্ছে ইউ কে।' এই কথা বলতে গিয়ে ওর গলা বুজে এসেছিল। এই ঘটনার পর

অনেকদিন পার হয়ে গিয়েছে। পার্ক স্ট্রিটের ক্যাফে-টাও আর নেই। ছেলেটাও ক্যাফের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এই কাজটা নাকি তেমন সম্মানের নয়। অন্য কাজ করতে চায়। অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় সে জানিয়েছিল তার বাড়িতে পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। আমি জিগ্যেস করেছিলাম, 'তুমি বিয়ে করবে?' সে জোরের সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'অফ কোর্স করব।' আর সেই ছবিটা? নাহ্! সেই ছবিটা সে ডিলিট তো করেইনি, বরং সেটার এক কপি ল্যামিনেট করে বাঁধিয়ে রেখেছে। ছেলেটা ডিফেন্স নিয়ে তড়িঘড়ি বলেছিল, 'আমার মোবাইলটা ভাল না। যদি হ্যাং করে ছবিটা নষ্ট হয়ে যায় তাই...'

নষ্ট হয়ে যাওয়ার খুব ভয় আমাদের। হবে নাই বা কেন। এক জীবনে খুব বেশি পাওয়ার তো কিছু নেই। তাই যতটুকু যা-পাওয়া সেটাকে কিছুতেই হারাতে দিতে চাই না। কিছুটা স্বার্থপর আর লোভীর মতোই আঁকড়ে বসে থাকতে চাই। আমার পেনটা, পুতুলটা, ঘড়িটা, খেলনাটা, চকোলেটটা, টিফিনটা, বালিশটা, বাড়িটা, মানুষটা, আদরটা—স...অব আমার। কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। যেই হারিয়ে ফেললাম অমনি কান্না পেয়ে যায়। যাহ্! আমার বাড়িতে আমি আর ঢুকতে পাব না! সেখানে তালা পড়েছে। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ না কি ভিতর থেকে, সবসময় বোঝা যায় না। শুধু বুঝতে পারি আমি ঢুকতে পারছি না আমার ভিতরঘরে। 'ভিতরে আসতে দাও' বললেও কেউ দরজা খুলছে না। তখন একটা ফাঁকা বাসে চেপে একা-একা ফেরার পালা। ইচ্ছে করে দু'টো টিকিট কাটি। একটা আমার, একটা তার। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে লোক দেখি, অন্ধকার হয়ে আসা ফাঁকা রাস্তায় নিয়ন আলো দেখি, মনে-মনে প্রার্থনা করি বাসটা যেন দেরি করে পৌঁছয়। স্টেশনে পৌঁছে মনে হয় আজ কোথাও ফেরার নেই। ট্রেন মিস হয়ে যায়। একটা অন্য ট্রেনে চাপি। ট্রেনটা স্পিড নিয়ে তারপর স্লো হয়ে একটা সময়ে থেমে যায়। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সেটা কারশেড। সারি-সারি ট্রেন দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে এক-একটা শেডের তলায়। প্রত্যেকটার মাথায় আলো জ্বলছে। হাজার ওয়াটের নিয়নের তলায় কী ভীষণ একা আর দুখী মনে হয় ওদের। জোরালো আলোয় ওদের ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়। ঠিক যেন কেউ তা ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে। একা-একা ওরা দিন গুনছে মৃত্যুর অপেক্ষায়। আত্মীয়-পরিজন ভালবাসার মানুষদের কাছ থেকে অনেক দূরে একা হাসপাতালে শুয়ে থাকার মতো। ডাক্তার, নার্স জানে সময় শেষ, তাই কেউ অ্যাটেন্ড করছে না। শুধু আলো জ্বালিয়ে চলে গিয়েছে। তামাশা দেখতে চাইলে যেন মিস না করে কেউ। যদি কেউ শেষ দেখা দেখে নিতে চায়। চোখ সরিয়ে নিই। ট্রেন ছেড়ে দেয়। ট্রেনের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয় এদেরও কেউ কেউ ওই কারশেডের ট্রেনগুলোর মতোই। তফাত বলতে এদের থামার পারমিশন নেই। যত কষ্টই হোক চলতে হবে। মুখে রক্ত উঠে এলেও দৌড়তে হবে পরদিন ভোর ভোর। এদের যুক্ত থাকাও নেই, বিচ্ছেদও নেই। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে প্রত্যেকে যেন আলাদা-আলাদা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। বিচ্ছিন্ন থাকতে-থাকতে বিচ্ছেদের বোধটাই অসাড় হয়ে গিয়েছে।

এরকম এক-একটা মানুষ হয় যার গোটা জীবনটাই সবকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার জেঠুকে তেমন দেখেছিলাম। উনি বিয়ে করেননি। প্রথমে আমাদের সঙ্গে, তারপর একাই থাকতেন। ভীষণ একগুঁয়ে আর জেদি ছিলেন। ওঁর জগৎ বলতে ছিল, একটা রেকর্ড প্লেয়ার, অসংখ্য গানের সিডি, স্পোর্টস ম্যাগাজিন আর একটা ভাঙা রেডিও। সারাদিন রেডিও শুনতেন। খেলার বইগুলোকে আগলে আগলে রাখতেন, গানের রেকর্ডগুলো বের করে ঝেড়ে-পুছে আবার সযত্নে রেখে দিতেন। কথায়-কথায় মাথা গরম করে ফেলতেন। ছোটদের সঙ্গে খুব ঝগড়া হত ওঁর। ক্রিকেটে আমরা ইন্ডিয়া-কে সাপোর্ট করতাম আর জেঠু হেসে বলতেন : আজ পাকিস্তান ভারতকে বলে বলে হারাবে। ছোটরা সবাই রেগে যেত। বড়রাও মাঝে-মাঝে বলে উঠত, 'আহ্, এ-সব বলার কী দরকার।' আমরা এককাট্টা হয়ে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করতাম। জেঠু একা বিশেষ পেরে উঠতেন না। গজগজ করতে-করতে চুপ করে যেতেন। দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে থাকলে আমরা ওঁর সিগারেট চুরি করতাম, স্পোর্টসস্টার থেকে ছিঁড়ে নিতাম ওয়াসিম আক্রম, ওয়াকার ইউনিস, ইমরান খানের পোস্টার। ঘুম থেকে উঠে ভয়ানক চেঁচামেচি করতেন। একলা মানুষটাকে জব্দ করাতেই যেন আমাদের মজা ছিল। ছোট-বড় কারও মতের সঙ্গে জেঠুর মিল ছিল না। বড়রা যেটা বারণ করত জেঠু সেটাই করতেন। হাই সুগারের জন্য জেঠুর মিষ্টি খাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু আমরা সবাই জানতাম, সকালে-বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে জেঠু মোড়ের মাথার মিষ্টির দোকানে বসে রসগোল্লা আর বোঁদে খেতেন। চিলড্রেন'স ডে-র দিনে জেঠুর জন্মদিন। সেদিন চিনি ছাড়া পায়েস হত। মনে-মনে খুব রাগ করতেন ওই পায়েস দিলে। সবার মতের বিপরীতে গিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াতেই যেন আনন্দ ছিল তাঁর। কিন্তু এই একলা মানুষটা যে একা-একাই দুম করে মরে যাবে সেটা ভাবতে পারিনি। একদিন খুব ভোরে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। তারপর আর ফেরেননি। বেলা হয়ে যাওয়ায় বাবারা খুঁজতে বেরিয়েছিল। অন্য পাড়ায় কোনও এক রাস্তায় পড়ে থাকা দেহটার খবর দেয় কেউ। স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের একা-একা কাউকে না-বলে চলে যাওয়াটা যেন তাঁর গোটা জীবনের বিচ্ছিন্ন থাকাকেও হারিয়ে দেয়। তারপর গানের রেকর্ডগুলো ধুলোয় পড়ে-পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। ভাঙা রেডিওটা হারিয়ে যায়। খেলার বইগুলো পুরনো কাগজের সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। একটা বিচ্ছেদ আরও বিচ্ছেদ ডেকে আনে। পরে আমার কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় জেঠু আসলে মনে-মনে ইন্ডিয়াকেই সাপোর্ট করতেন। ততটা সাপোর্ট বোধহয় আমরাও করতে পারিনি। তাঁর থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছি শুধু।

মাঝে মাঝে মনে হয় এখন আমরা কেউ যুক্ত হতে পারি না আসলে। যোগাযোগের ব্যবস্থা হাতের মুঠোয়, তাই এখন হাত-ধরা ভুলে গিয়েছি। দু'টো হাত আগে পাশাপাশি হাঁটত, হাতে হাত রেখে। এখন মোবাইল সামলায়। আগে যখন ফোন বুথে দাঁড়িয়ে থেকে লাইন পেতে হত তখন একটা 'হ্যালো'-য় ছুঁয়ে ফেলা যেত মানুষটাকে। নিশ্বাসের ওঠা-পড়ায় বলে দেওয়া যেত সে এখন কেমন আছে। এখন মনে হয় সেই সময়টার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। সেই প্রবলভাবে যুক্ত থাকার মধ্যে একটা আকর্ষণ ছিল, একটা বেঁচে-থাকা ছিল, বাড়ি ফেরার টান ছিল—যেটা আজ কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। চারাগাছে এখন আর কেউ জল দেয় না। আগের মতো ফুল ফোটে না। আর যদিও বা ফুল ফোটে, সেটা আর ক্যাবলার মতো হাঁ করে তাকিয়ে দেখি না। দিন কেটে যায়, রাত কেটে যায়, মাস কেটে যায়, বছর কেটে যায়। চারাগাছ অযত্নে বাড়ে। তার চুলে একটু একটু পাক ধরেছে। তার সঙ্গে কথা হয় সংসারের। তার সঙ্গে কাজের কথাও হয়। সে তার অসুখের কথা বলে, সে আমার রোগের কথা শোনে। 'এখন সময়টা ভাল যাচ্ছে না' বলে চারাগাছ আমার পাশে থাকে, আমিও থাকি পাশে পাশে। কিন্তু এখন আর একসঙ্গে বাঁচি না কেউ। এখন আর বলি না অসময়ে ফুল ফোটার কথা। এখন আর বসন্ত আসে না। খুব ভালও থাকি না, খুব খারাপও থাকি না। খুব আনন্দও হয় না, খুব কষ্টও হয় না। খুব শান্তিও পাই না, খুব অশান্তিও হয় না। সেইসব কিছুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে।

কেবল একটা মায়া পড়ে থাকে। ওই কারশেডে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনগুলোকে দেখে যেমন মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ছিঃ আলোগুলো নিভিয়ে দিল না কেউ! ওদের হাড়গিলে চেহারাটা কেউ চাদর দিয়ে ঢেকে দিল না! তাই চারাগাছের কষ্ট হলে এখন আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলি। চাদর দিয়ে ঢেকে রাখি শীতকালে। আমাদের জন্য এখনও কারশেড অ্যালট করা হয়নি। এখনও অনেকটা পথ বাকি!

ইচ্ছে বিরক্তি রাগ, বেফাঁস কিছু কথা

মাঝে মাঝেই মনে হয়, এই যে এত রাজনৈতিক দল আমাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে তাদের সঙ্গে আমাদের তো তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। তবু তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী চলতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের নাগরিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে বিধায়ক এবং সাংসদদের নির্বাচিত করবেন। বিধায়কদের যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের প্রাদেশিক সরকার গঠন করার সুযোগ দেওয়া হবে, সাংসদরা লোকসভায় এই একই রীতিতে দেশ-শাসনের সুযোগ পাবেন।

ইংরেজরা যখন এই দেশটাকে দখল করেছিল তখন আমার পূর্বপুরুষরা কেমন ছিলেন তা জানার চেষ্টা করেছিলাম। মোটামুটিভাবে বলা যায় দেশের মাত্র কুড়ি শতাংশ মানুষ মনে করতেন তাঁরা পরাধীন। আশি শতাংশ নির্লিপ্ত ছিলেন। মুসলমান নবাবের শাসন থেকে বেরিয়ে এসে ইংরেজের অধীনে থেকে থেকে তাঁরা পৃথিবীটাকে জানতে পেরেছিলেন। পলাশির যুদ্ধের অনেক আগে শেক্সপিয়র সাহেব হ্যামলেট-ম্যাকবেথ লিখেছেন, যার কথা তাঁরা নবাবের অধীনে থাকলে জানতেও পারতেন না। পৃথিবীর অন্যতম সভ্য দেশের মানুষ তাঁদের শাসন করছে জেনে নিশ্চিন্তে ছিলেন। চারবেলা ভাল খাবার আর শান্তিতে থাকতে পারার পর আর কিছু চাওয়ার কথা ভাবলেন না। কিন্তু ওই যে বাকি কুড়ি শতাংশ মানুষ, যাঁরা ইংরেজদের কাছেই ইংরেজি শিখেছেন, ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের কায়স্থদের মতো শুধু বাবু হয়ে থাকতে যাঁদের ইচ্ছে করছিল না, তাঁরা উসখুস করছিলেন। ইংরেজরা যেসব বই তাঁদের পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল তা থেকে তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের, স্বাধীনতাযুদ্ধের কাহিনি জেনেছিলেন। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় বোধ তখনও তাঁদের মনে তীব্র হয়নি। তাঁরা জানতেন স্বাধীনতা একটি লজেন্সের নাম নয় যে চাইলেই পাওয়া যাবে। তখন এদেশে কোনও রাজনৈতিক দল ছিল না। ভাবতে অবাক লাগে দু'শো বছর আগে এইরকম পরিস্থিতি ছিল।

ওই কুড়ি শতাংশের সিকিভাগ মানুষও উদ্যোগী হননি স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করার। এমনকী জাতীয় কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখনও তাঁদের ইস্তেহারে স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি। জাতীয় কংগ্রেস তখন প্রথম রাজনৈতিক দল যাঁদের ভূমিকা ছিল দেশের মানুষের সুবিধে-অসুবিধে সম্পর্কে ইংরেজ সরকারকে সচেতন করার।

বরং কিছু মানুষের মনে হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে যে সামাজিক অন্ধকার মানুষের ওপর চেপে বসে আছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা অনেক বেশি জরুরি কাজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়-রা সেই চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। আক্ষেপের বিষয়, একমাত্র সতীদাহ প্রথা প্রায় বন্ধ হওয়া ছাড়া অন্য প্রচেষ্টাগুলো তেমন সাফল্য পায়নি। এখনও এই দেশে তেরো চোদ্দো বছরের মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, অবিবাহিতা মেয়ের সংখ্যা এত বেশি যে বিপত্নীক ছাড়া বিধবার জন্যে পাত্র খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সামাজিক অন্ধকারের চাপটা যতটুকু কমেছে তা কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রচারের জন্যে কমেনি, কমেছে অর্থনৈতিক চাপের কারণে। দেশভাগ এবং এদেশে উদ্বাস্তুদের আসার পর যে তীব্র প্রতিক্রিয়া অর্থনীতির হল তার বাইরে উল্টো হাওয়া বইল সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে।

প্রথম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের হাঁটি হাঁটি পা পা দেখে ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন স্বাধীনতাকামী কিছু মানুষ। তাঁরা জেনেছিলেন বাঘ বা সাপকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কব্জা করা যায় না। তাদের সঙ্গে লড়াই করে না হারালে নিষ্কৃতি নেই। এই লড়াই করার চেষ্টায় কিছু কিছু সংগঠন তৈরি হল যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন।

মনে রাখতে হবে, আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ভারতীয়দের যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ছিল না। আগ্নেয়াস্ত্র আসার পর তার ব্যবহার করে কুশলী হওয়ার সুযোগও তাঁরা পাননি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু মানুষ শুধু জ্বলন্ত আবেগ বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইংরেজকে তাড়িয়ে জন্মভূমিকে স্বাধীন করতে। ইতিহাস এঁদের বিপ্লবী বলেছে। পরিবর্তনকামী সশস্ত্র আন্দোলন যে বিপ্লব নয় তা জেনেও ওঁদের বিপ্লবীর সম্মান দেওয়া হয়েছে। কোনও দেশে বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে তার জনসাধারণকে সামিল করতে হয়। যেমনটা রাশিয়া অথবা চিনে হয়েছিল, হয়েছিল আমেরিকায়। ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীনরা যখন ইংরেজ হত্যায় মরিয়া তখন দেশের সাধারণ মানুষ ছিল প্রায় নির্লিপ্ত। অনুশীলন সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনের অবসান করতে মরিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁদের পাশে সাধারণ মানুষের সক্রিয়



অবস্থান না থাকায় বিদ্রোহ দমন করতে অসুবিধে হয়নি ইংরেজদের। আবার বলছি, যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, জীবন দিয়েছেন, তাঁরা সংগঠিত ছিলেন না। সেই সময় ইংরেজ বিদ্রোহীদের কোনও গ্রহণযোগ্য নেতা ছিলেন না। ফলে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল করেই বিদ্রোহ শেষ হয়ে গিয়েছিল। রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে গুলি চালিয়ে বিনয়-বাদল-দীনেশ শহিদ হয়েছিলেন। সাতচল্লিশের পনেরোই অগাস্টের আগে প্রায় দেড়শো বছর ধরে নব্বই বা পঁচানব্বই শতাংশ ভারতবাসী ইয়েস স্যর নো স্যর করে দুধেভাতে থাকতে চেয়েছে। আর আমরা, বাঙালিদের নিরানব্বই ভাগ, কোনও ঝুটঝামেলায় যেতে চাইনা, চাইনি।

ওই সময়ে কংগ্রেস একটু একটু করে রাজনীতির পথে হাঁটছিল। গান্ধীনির্ভর হওয়ার পর কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল। আর এই চাওয়ার মধ্যে ভবিষ্যতের ক্ষমতাপ্রাপ্তির গন্ধ মিশে থাকায় ছোট বড় কিছু দল গজিয়ে উঠল যার অন্যতম হল মুসলিম লিগ। যেহেতু তখন ইংরেজ শাসন চলছে তাই এই রাজনৈতিক দলগুলোর ইচ্ছে অনিচ্ছার পরোয়া করত না দেশবাসী। বরং তাদের বেশ কিছু অংশ গান্ধীজিকে পছন্দ করে ফেলল। টগবগে ছেলেগুলো ইংরেজ মারতে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলছে, পুলিশের গুলি খেয়ে মরছে, এসব দেখতে দেখতে একসময় বিবেকবাবু নড়েচড়ে বসেন। ঠিক নকশাল আন্দোলনের শুরুর দিকে ছেলেগুলো বাড়িতে এসে খাবার চাইলে মা-বউদিরা সস্নেহে দিয়ে দিতেন। আচ্ছা, ওরা দেশের উপকার করতে চেয়ে পুলিশের গুলি খেয়ে মরছে তার আগে একটু পেট ভরে খেয়ে নিক। নকশালদের ভয়ে তাঁরা খাবার দিতে বাধ্য হয়েছেন পরে, যখন আর মনে মায়া ছিল না। একই প্রতিক্রিয়া হয়তো দশ শতাংশ ভারতবাসীর হয়েছিল। গান্ধীজি ইংরেজদের মারতে বলছেন না, তাদের সঙ্গে অসহযোগ করতে বলছেন। বিদেশি দ্রব্য বর্জন করতে বলছেন। নিজের হাতে চরকা কাটতে বলছেন। আর এগুলো করলে যদি দেশের জন্যে কিছু করা হয় তা হলে মন্দ কী! গান্ধীজির ডাকে লবণ আন্দোলনে সামিল হয়ে পুলিশের লাঠির ঘা খাওয়া মানুষ বৃদ্ধ বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনসন নিয়েছেন। নাতি-নাতনিরা গর্ব করে বলেছে, আমাদের দাদু স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছেন।

এদেশের মানুষ একসময় কংগ্রেসকে একটা আলাদা রাজনৈতিক দল বলে মনে করত না। যেমন মোহনবাগান ক্লাব



ব্রিটিশদের হারিয়ে প্রথম আইএফএ শিল্ড যখন জিতেছিল তখন যে কোনও ভারতীয় গর্বিত হয়ে ভেবেছিলেন আমরাই জিতেছি। কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল স্বাধীনতার অনেক আগে। কিন্তু তাঁদের তেমন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। তার ওপর তাঁদের আচরণ এবং কথাবার্তায় বিদেশি তাত্ত্বিকদের গন্ধ এত বেশি ছিল যে সাধারণ মানুষ একটু দূরেই সরে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একজন বুর্জোয়া কবি ইত্যাদি কথাবার্তা তাঁদের একঘরে করে রেখেছিল।

ইতিহাস বলছে, কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে নয়, বিদ্রোহীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ভয় পেয়ে নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ার কারণে ইংরেজরা এদেশ থেকে চলে যাওয়ার একটা সম্মানজনক পথ খুঁজছিল। এই ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করলেন গান্ধীজি এবং জিন্নাসাহেব। ভারতবর্ষের মানুষের ভাগ্য লিখলেন তাঁরা। বন্দুকের গুলিতে দেশ দখল স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছে অনুযায়ী মানুষকে যা বলতে হবে তা ওই ঘটনার মধ্যে দিয়ে ঘোষণা করা হল। ভাবতে অবাক লাগে, সেসময় অন্য রাজনৈতিক দলগুলো কী করছিলেন? দেশটাকে দু'টো ভাগে ভাগ করা হল ধর্মের ভিত্তিতে অথচ কোনও আন্দোলন হল না? রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ বছর আগে দেশভাগের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন। ছ'বছর আগে তিরোধান হওয়ায় নিজের দেশের মানুষের কীর্তি তাঁকে দেখতে হয়নি।

দেশভাগ হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টি চিৎকার করল, 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়।' সেই সময়ে এই স্লোগান মূল্যহীন ছিল। তার আগে ওঁরা নেতাজিকে বিশ্বাসঘাতক বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরোধিতা করতে গিয়ে ইংরেজদের সমর্থন করেছিলেন। তাছাড়া গান্ধীজি দূরের কথা, নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো কোনও নেতা তাঁদের দলে না থাকায় গ্রহণযোগ্যতা কমে গিয়েছিল। পার্টিকে অবৈধ ঘোষণা করা হল, কমিউনিস্ট নেতারা কেউ জেলে কেউ গোপন আস্তানায় গিয়ে লুকোলেন।

কমিউনিস্ট পার্টি যখন আবার স্বীকৃতি পেল তখন ভারতবর্ষের সংবিধান তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের অভিভাবকত্ব পাওয়ার জন্যে লড়াই-এ নেমে গিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। বলা বাহুল্য ইতিহাস সঙ্গে থাকায় কংগ্রেস বেশি শক্তিশালী ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি যতই খাদ্য আন্দোলন, বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আগুন জ্বালাক, কৃষকদের বঞ্চনা তুলে ধরুক, জনসাধারণ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

তখন রাজনৈতিক দলগুলো হরতাল ডাকত। সাতষট্টি সাল পর্যন্ত তার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। ফলে মানুষ তিতিবিরক্ত ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলো এমন কিছু করত না যাতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

এদিকে বিধানচন্দ্রের মতো নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়ে বাঙালি গর্বিত ছিল। কারণ এই নেতা কেন্দ্রের কাছে মাথা নোয়াননি। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু নাকি তাঁকে সমঝে চলতেন। অন্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে বিধানচন্দ্রের ইমেজ অনেক উঁচুতে ছিল। কিন্তু তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের শেষ দিকে টের পাওয়া গেল কংগ্রেসের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। তবু কংগ্রেস দিন আনি দিন খাই দলে পরিণত হয়নি। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মতো সৎ গান্ধীবাদী নেতারা মুখ্যমন্ত্রী হলে তাঁর দলের পুঁটি-পার্সেরাও বোয়াল কাতলা হয়ে উঠল। দুর্নীতি শব্দটি তাঁদের অভিধান থেকে মুখে গেল। তখন দেশের যত জমিদার, কন্ট্রাক্টর কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ নিয়ে ঘুরে নামে-বেনামে সম্পদ বাড়িয়ে যাচ্ছে। ওই সময়, ওরকম অরাজকতার সময়ে, সাধারণ মানুষ দূরের কথা, কমিউনিজমে অন্ধ কোনও ব্যক্তি ভাবতেও পারতেন না কংগ্রেসের রাজত্ব শেষ হতে চলেছে। এর জন্যে তাঁরা কোনও প্রস্তুতিও নেননি। কিন্তু ওই পরিস্থিতি দেখে কিছু বামপন্থী নেতার মনে হয়েছিল বিপ্লবের সময় এসে গিয়েছে। সংসদীয় পথে না চলে তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে হাঁটার কথা ভাবলেন। এইসময় অজয় মুখার্জি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা কংগ্রেস দল তৈরি করলে বিরোধীরা তাঁদের সব আদর্শ ভুলে গিয়ে তাঁকে নেতা মেনে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট তৈরি করলেন।

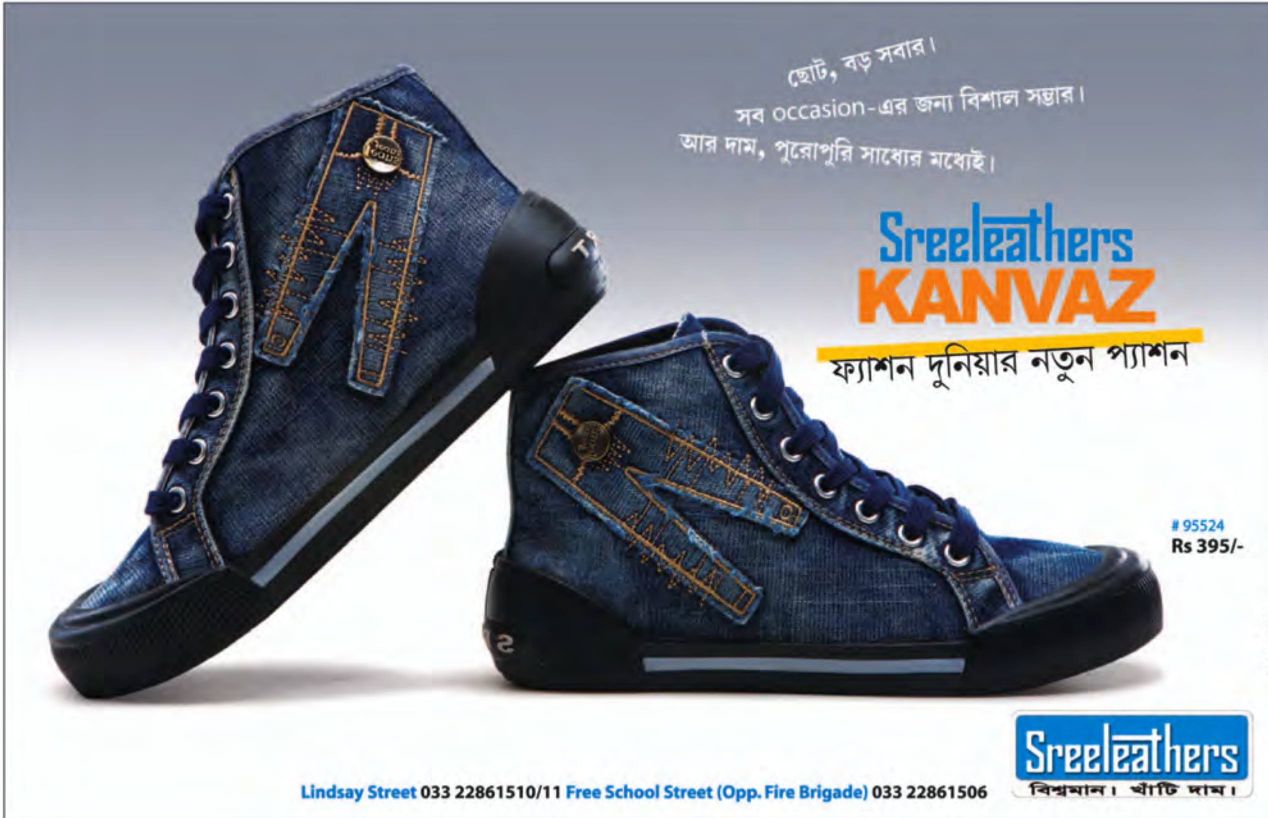
পশ্চিমবাংলার মানুষকে নিয়ে ছেলেখেলা শুরু হল ওই সাতষট্টির নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের পর থেকে। জয়ের স্বাদ পেয়ে যাওয়ায় যুক্তফ্রন্ট ভেঙে সমভাবাপন্ন দলের বামফ্রন্ট তৈরি করতে দ্বিধা করলেন না সিপিএম দল।

নকশাল আন্দোলন, বামেদের দ্বিচারিতা দেখে মানুষ কংগ্রেসকে ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু তখন সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে যুব কংগ্রেসীরা সোচ্চার হল। সেইসঙ্গে জরুরি অবস্থা জারি এবং তার অপব্যবহার কংগ্রেসকে ধুয়ে মুছে প্রায় শেষ করে দিল। বামফ্রন্ট ফিরে এল সিংহাসনে। কংগ্রেসের অবস্থা নীরক্ত শরীরের মতো, যার নড়েচড়ে বসার ক্ষমতাও নেই।

বত্রিশ বছর ধরে মানুষ এই কারণেই বামফ্রন্টকে ভোট দিয়ে এসেছে। কিন্তু কথা হল, কত মানুষ ভোট দিয়েছে? হিসেব বলছে শতকরা চল্লিশ ভাগ মানুষ ভোট দেননি। অর্থাৎ এই মুহূর্তে যদি পশ্চিমবঙ্গে আট কোটি ভোটার থাকেন তা হলে তিন কোটি কুড়ি লক্ষ নির্বাচনে অংশ নেননি। কেন নেননি? কোনও সমীক্ষা হয়েছে বলে শুনিনি। যে চার কোটি আশি লক্ষ ভোটার ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের ভোটে জয়ী দলের সঙ্গে পরাজিতদের ভোটের ব্যবধান খুবই কম। ধরা যাক, বামফ্রন্ট ভোট পেয়েছে দু'কোটি আশি লক্ষ, বিরোধীদের ভোট যোগ করলে তা দাঁড়াবে দু'কোটিতে। অর্থাৎ যে তিন কোটি কুড়ি লক্ষ ভোটার ভোট দিলেন না তাঁদের চেয়ে অনেক কম ভোট পেয়েও বামপন্থীরা বত্রিশ বছর ধরে ক্ষমতায় রইলেন। মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়া দলটির বিরুদ্ধে ভোট দিতে গিয়ে ভোটাররা দেখেছেন আর কাউকে ভোট দেওয়া যাচ্ছে না। কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল হওয়ার পর তাঁদের নেত্রী বামফ্রন্টবিরোধী, সিপিএমের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার ছাড়া আর কিছুই করছেন না। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল গাঁটছড়া বাঁধতে ভোটাররা ভাবলেন এরা যদি শেষ পর্যন্ত এক থাকে তা হলে বামফ্রন্টের বিকল্প হতে পারে।

স্বাধীনতার আগে এবং পরে যে দীর্ঘ সময় গেল, এখনকার মতো ভয়ঙ্কর অবস্থা কখনও হয়নি। কথায় কথায় বন্‌ধ, অবরোধ, রাস্তার পুরোটা দখল করে মিছিল করতে যে কোনও রাজনৈতিক দল অভ্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রী আক্ষেপ করেন এই বলে, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এমন দলের সদস্য যারা বন্‌ধ রাজনীতিকে হাতিয়ার করে। দেশের সরকার সমস্যার সমাধান না করে বন্‌ধ ডেকে মানুষের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে। বিরোধী দলের নেত্রী মাঝে মাঝে এমন শিশুসুলভ বায়না করেন যা অবাক হয়ে দেখা ছাড়া আমাদের অন্য কোনও উপায় নেই। একসময় তিনি বললেন, মাও বলে কিছু নেই, সিপিএম-ই মাওবাদীর নামে খুন করছে। আবার তাঁকেই বলতে শুনেছি মিলিটারি নামিয়ে কেন্দ্র মাওবাদীদের ঠান্ডা করুক। শেষতম বললেন, মাওবাদীদের তিনি সময় দিচ্ছেন আলোচনায় বসার জন্যে। কোনটা সত্যি কথা? নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে তত বামফ্রন্টের নেতারা বলছেন, অনেক ভুল হয়ে গিয়েছে, মানুষের কাছে গিয়ে ভুল স্বীকার করতে হবে। কথাগুলো এখন কেউ বিশ্বাস করছে না। বিরোধী নেত্রী বলছেন, এখন থেকে তৃণমূলই শেষ কথা বলবে। তা হলে কংগ্রেস কী করবে? পশ্চিমবাংলায় সংবিধানস্বীকৃত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু লোকে দেখছে হাসপাতাল, স্টেডিয়াম তৈরি থেকে ডুবে যাওয়া মানুষের কাছে ছুটে গিয়ে বিরোধী নেত্রীর ক্রিয়াকলাপ নিরুচ্চারে ঘোষণা করছে, এখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধারণ মানুষ যতদিন এমন সাধারণ থাকবে ততদিন তাদের পুতুল হয়ে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই।


ছোট, বড় সবার।
সব occasion-এর জন্য বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
95524
Rs 395/-
Genesis 2877
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street 033 22861510/11 Free School Street (Opp. Fire Brigade) 033 22861506

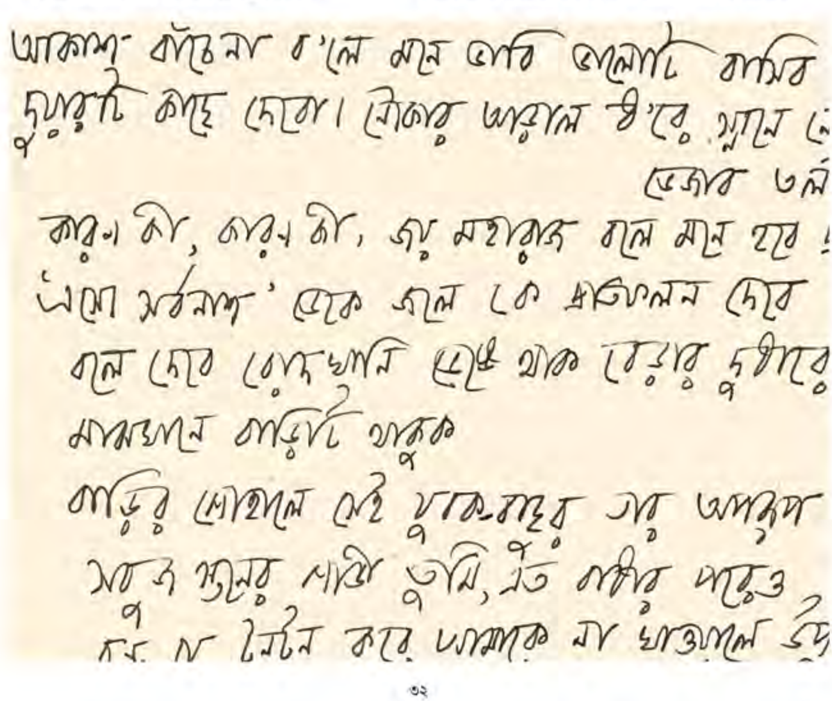
কবিতা থেকে আলাদা করে নিয়ে এক-একটা লাইন মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। জানি না আপনাদের হয় কি না। আমার কিন্তু হয়। পুরো কবিতাটি মনে নেই—একটা লাইন কেবল ঘুরে-ফিরে দেখা দিয়ে যাচ্ছে। যেমন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কেবলই দেখা হত জীবনানন্দ দাশের। আজ সেইরকম দু'টো লাইনের কথা একটুখানি বলি। দু'টো লাইন কিন্তু আসলে দু'টো আলাদা কবিতার তিনটে লাইন। একটি হল : তিসিবনে একা শিশু ভেসে আছে নিশুতি উদাস। এই লাইনটি একটি কবিতার শেষ লাইন। শেষ লাইনের আগে একটি স্পেসও দেওয়া আছে। এই লাইনটি আপনি বলে দেখুন কয়েকবার—বললে, মনে হবে গাছপাতার মধ্যে দিয়ে মৃদু হাওয়া যেন বয়ে যাচ্ছে। প্রধানত 'শ' 'স' ধ্বনির এই বহমানতা, এই হাওয়া বইবার ধ্বনির একটি অনুভব দিচ্ছে। দু'টো 'ত' আগে আর মধ্যে এসে ব্যালান্স করেছে। এর পাশাপাশি আরও একটি লাইন ঘুরে যাচ্ছে মনে : 'ক্যানভাসারের কানে বলিসনে ডানকুনি প্যাসেঞ্জারে।' ক্যানভাসার, গান, বলিসনে, প্যাসেঞ্জার ও ডানকুনি। এগুলো পরপর এসে এসে যে ধ্বনিসংগীত তৈরি করছে, তাকে সংগীত না বলে গুঞ্জন বলা বেশি ঠিক। এর অর্থের উদ্দেশ্য কী সেটা দেখতে হলে, এই চারটে লাইন দেখি :

আর সেই দিদি জানে, জানে তবু দাঁতে নিয়ে ঘাস
বড়ো জা-র ছেলে কোলে কোন্নগরে ফিরছে পিঞ্জরে
ভাইফোঁটা তুলে রাখে দেওয়ালে আমার মাথা খাস
ক্যানভাসারের কানে বলিসনে ডানকুনি প্যাসেঞ্জারে

এই কবিতাটির নাম 'দিদি'। কবিতাটির শুরুর চার লাইন ছিল এরকম :

পৃথিবীর এককোণে পড়ে আছে এক রাশ মুকুল প্রণত
আমাদের একজন ভাই
আমরা দেখি না তাকে, অথবা মূলত
দেখি যেন এককোণে অবজ্ঞাত পড়ে আছে, তাই।

ভাই অবজ্ঞাত। কিন্তু দিদিও কি অবজ্ঞাত নয়? যে দিদি, বড়ো জা-র ছেলে কোলে কোন্নগরে ফিরছে পিঞ্জরে। এখানে দাঁতে নিয়ে ঘাস কথাটাও আছে—অর্থাৎ সে-দিদি শ্বশুরবাড়ির কারাগারে বাস করতে বাধ্য আর সে কারাগার কোনও শহরতলিতে। 'কোন্নগরে ফিরছে পিঞ্জরে' এই অংশটিতেও ধ্বনিগুঞ্জন গোপনে কাজ করে ফেরে। বড় জা-র ছেলে মানুষ করছে যে দিদি, সে কি সন্তানহীনা? আমরা জানি না। কিন্তু, দিদিরও নিজের ভাইকে মনে পড়ে। ভাইয়ের সঙ্গে হয়তো দেখা হয় না। তাই ভাইফোঁটা তুলে রাখে দেওয়ালে। ভাই হয়তো বাইরে থাকে, আসতে পারছে না, মেয়েরা তখন দেওয়ালে ফোঁটা দেয়। এখানে 'তুলে রাখে' কথাটি বড় মর্মছোঁয়া কথা। বাচ্চা স্কুলে গিয়েছে, এ মুহূর্তে বাড়ি নেই, এসে খাবে, ভেবে যেমন অনেক সময় তার জন্য কোনও ভাল খাবার তুলে রাখা হয়, এই মুহূর্তে দিতে না-পারা সেই মঙ্গলকামনা, সেই ভাইফোঁটা, সেরকমই তুলে রেখে দেওয়া হল। কোথায় রাখা হল? দেওয়ালে! দেওয়ালই তখন ভাইয়ের ললাট হয়ে ফোঁটা রেখে দিল। দেওয়াল, ভাইকে পাঠিয়ে দেবে সেই ভাইফোঁটা। ক্যানভাসার কী করে এল! আন্দাজ করা যায়, ওই যে ডানকুনি প্যাসেঞ্জারে ফিরছে দিদি, সেই ট্রেনের কম্পার্টমেন্টেই যে হকার, বা ক্যানভাসার কিছু ফেরি করছে, যে তার ভাইয়ের চেনা, ভাইয়ের বন্ধুর বন্ধু হয়তো—কোন্নগরে, দাঁতে ঘাস চেপে যে-দিদি বড় জা-র ছেলে কোলে পিঞ্জরে ঢুকবে—অত্যন্ত নিম্নবিত্ত সেই দিদির সংসার ফুটে উঠছে; সেই সংসারের ভিতরকার ভাই দিদি-র সম্পর্কে টান লাগছে এ-কবিতায়। ক্যানভাসারের কানে বলিসনে, নিজেকেই বারণ করা—কারণ নিজের শ্বশুরবাড়িতে যে কষ্টে থাকি, ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা করতে পারি না, সে-কথা



বাইরের লোককে বলে কী হবে! আর দু'টো কথা হবে তা থেকে। অথচ এ তো আমার ভাইয়ের চেনা—একে বললে হয়তো ভাই খবর পেত। তবু বলিসনে, মন, বলিসনে। সংসারের খুঁটিনাটি কলহগঞ্জনা বাড়বে তাতে। এই ক্যানভাসারকে দেখে ভাইয়ের কথা মনে পড়া একটি অন্য মনে পড়াকে এনে দিল আমার কাছে। কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া—মনে পড়ল। মনে পড়ল, ভাইয়ের দেখা পাইলাম না, পাইলাম না। শচীন দেব বর্মণের গলা ফিরে এল নদীর হাওয়ায়। দূরের নৌকোয় একজন গাঙ বেয়ে চলে যাচ্ছে—সে কি আমার ভাইকে খবর দেবে—আমার খবর? কতদিন ভাইয়ের দেখা পাইনি যে। ভাইফোঁটা তুলে রাখে দেওয়ালে আমার মাথা খাস। পদ্মার উদার উধাও জলবাতাসে দূরের মাঝির দিকে যে-কথা ভাসিয়ে দেওয়া যেত—এই ভিড়ভর্তি ঘিঞ্জি ডানকুনি প্যাসেঞ্জারে তা বলা হল না। এ এক আধুনিক ভাটিয়ালির চিরকালীন পুকার। 'কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া' গানের মর্ম যেন অতীত থেকে ফিরে এসে আশ্রয় নিল কবিতায়। 'ক্যানভাসারের কানে বলিসনে ডানকুনি প্যাসেঞ্জারে' লাইনটির ধ্বনিগুণ অকারণ নয় হয়তো। ভিড়ের ওই ঘেঁষাঘেঁষি ঘষা লাগা গায়ে-গায়ে লাগা ভিড়চরিত্র যেন 'বলিসনে ডানকুনি প্যাসেঞ্জারে' বাক্যাংশটিতে কিছুটা ধরা পড়েছে—এও লক্ষণীয়—অক্ষরবৃত্তের ধারা, এই কবিতার শেষ দশ মাত্রায় এসে, অক্ষরবৃত্তকে অটুট রেখেও যেন স্বরবৃত্তের আওয়াজে বাজছে: বলিসনে ডানকুনি প্যাসেঞ্জারে। কাছাকাছি ঘেঁষা ভিড় তাড়াতাড়ি লোক পেরিয়ে নামার তাড়া, হয়তো ক্যানভাসারের পরের স্টেশনে নামা—হয়তো দিদিরই গন্তব্য এসে গেল—সেই দরজার কাছে যাওয়ার হুড়োতাড়া আর টুক করে ভাইয়ের কথা তোলার প্রলোভন সামলানো সবটা মিলিয়ে হয়তো শেষের দিকে বেশি সিলেব্‌ল এসে পড়ে স্বরবৃত্তের আওয়াজ দিল। দোলাটা আনল স্বরবৃত্তের। যেন হুড়োহুড়িও আনল যাত্রীদের।

অথবা এ-সব কিছুই আনল না। এ কেবল কবিতা পড়তে পড়তে, তার ভিতরকার জীবনটা দেখার চেষ্টা করতে করতে—আমার উল্টোপাল্টা 'ভাবনা-সমুদ্দুর।' সুমনের গান থেকে নিলাম শেষ কথাটা। এই যে কবিতাটির শেষ কয়েক লাইন নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম, এটির লেখক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। 'তিসিবনে একা শিশু ভেসে আছে নিশুতি উদাস'-ও অলোকরঞ্জনেরই লাইন। দু'টিই এক বইতে পাওয়া যাবে—'লঘু সংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে'।

কিন্তু, কোন্নগরের পিঞ্জরে এই দিদির ফিরতে বাধ্য হওয়ার কথা পড়তে পড়তে, আমার আরেকটি সদ্যপঠিত কবিতার নতুন বউয়ের কথা মনে পড়ল। কবিতাটি তুলে দিই:

আটা চালার মতো বৃষ্টি পড়ছে আজ
আটচালা ঘরের উঠোনে
লাল পাড় শাড়ি পরা করুণ নতুন বউ
বাড়িতে ফেরার দিন গোণে

কবিতাটির নাম 'বাড়ি'। একটি বাড়িতে দাঁড়িয়ে, অন্য আরেকটি বাড়ির কথা ভাবছে এক মেয়ে। যে আর ঠিক মেয়ে নয়। যার পরিচয় বউ। নতুন বউ। একটি বাড়ির কথা ভাবছে, যা—বাপের বাড়ি। যে বাড়িতে দাঁড়িয়ে ভাবছে, তা সদ্য-পাওয়া শ্বশুরবাড়ি। কেমন সেই বাড়ি? আটচালা ঘরের উঠোন সে-বাড়িতে। এও খুব নিম্নবিত্ত একটি সংসারের কথা। বৃষ্টির অনেক-অজস্র বর্ণনায় বাংলা কবিতা ভরে আছে। বৃষ্টির এমন বর্ণনা কোথাও নেই। আটা চালার মতো বৃষ্টি পড়ছে। পুরো ছবিটি একটি ঝলকের বেশি সময় নেয়নি। ছুঁচের শীর্ষে যতটুকু মেদিনী থাকবে—তার ওপরেই যেন প্রতিষ্ঠিত কবিতাটি। এত স্বল্প। এত অব্যর্থ। এত নিশ্চিত। অথচ পুরো একটি জীবনকাহিনি এর মধ্যে বলা হয়ে গেল। এ ঠিক কবিজীবন নয়। আমার বাংলার জীবন। বাংলার গ্রামের কোনও অবজ্ঞাত মেয়ের জীবন। একটি লহমায় সে-কথা এই কবিতার উদ্ভাসিত করেছেন মন্দাক্রান্তা সেন—'বাকিটুকু বাক্যে বলা মানা' গ্রন্থে।

কোনও গ্রন্থে এখনও ধরা হয়নি, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে কেবল এইরকম একটি কবিতাও এই সূত্রে মনে পড়ছে।

বউভাত
প্রথমে তো, ভয়েই মূর্ছা গেছি প্রায়!
এত লোক, আলো, জরিশাড়ি,
মাংস ও গোলাপের গন্ধ,
খুব গা গুলোয়!
মা এসে মুখ মুছে দেবে বলে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি।
এখন চারপাশ, গয়না-দেখার চোখ,
নিন্দেমন্দর রাঙা ঠোঁট!
আর,
যার জন্য এতকিছু, তাকে একবারও কিন্তু
দেখা যাচ্ছে না,
আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সে-ও,
পরপর ভাবে থাকছে, এমনকী,
এমনি দরকারে
একবারও ঘরে ঢুকছে না।
কী আশ্চর্য!
আমাকেই, আমাকেই শুধু, ভাতকাপড়ের ঋণ
শোধ করে, ছেড়ে আসতে হল।
ঘুম ভেঙে, অচেনা মশারির মধ্যে জেগে উঠতে হল
আজ, সকালবেলায়

এই লেখাটি হল সদ্য বাড়ি ছেড়ে আসার কবিতা। না-বলে ছেড়ে আসা নয়। সবার সম্মতি নিয়ে আনন্দ-উৎসবের মধ্যে ছেড়ে আসা। এই মেয়েটিও নতুন বউ। নতুন বাড়িতে এইটেই তার প্রথম দিন। উৎসবের স্বাভাবিক বর্ণনা চলেছে। তার মধ্যে, এতদিনের অভ্যাসবশত মেয়েটি ভাবছে তার মা এসে মুখ মুছে দেবে কখন। মেয়েটিকে, অর্থাৎ নতুন বউকে, খুঁটিয়ে দেখছে সবাই। আসলে বউকে দেখছে না। বউ গয়নাপত্র কীরকম আনতে পেরেছে বাপের বাড়ি থেকে তাই জরিপ করছে। এখানে নিন্দেমন্দ-র রাঙা ঠোঁট কথাটি খুব লাগসই। কেননা, এখানে পুরুষদের দেখা যাচ্ছে না এখনও—নিন্দেমন্দ যারা করবে তারা মহিলাই, গহনা মাপছে যারা—বিয়েবাড়ি এসেছে তাই সবার খুব সাজগোজ তো থাকবেই। আর সাজের জন্যই ঠোঁট রাঙানো সবার। এও সম্ভব যে, খাওয়াদাওয়া শেষ করে এল বলে মুখে পান, তাই পানে লিপস্টিকে উজ্জ্বল রাঙা ঠোঁটের জৌলুস চোখে পড়ছে—কিন্তু সেই ঠোঁট থেকে কী কথা বেরচ্ছে—আরেকটি মেয়ের প্রতি, পরোক্ষে তার বাপের বাড়ির প্রতি? চাপা নিন্দেমন্দ। মেয়েটি, নতুন বউ বলে জড়োসড়ো ঠিকই—তবু, সে তার সহজাত অনুভব দিয়ে ঠিক বুঝতে পারছে, এরা নিন্দেই করছে তার। আর এমন একটা পরিবেশের মধ্যে এসে পড়া, মেয়েটির এই প্রথম। এই দিনটির জন্য অনেক আনন্দ-উদ্বেগ থাকে প্রায় সমস্ত মেয়েরই, তারও নিশ্চয় ছিল—কিন্তু সেই মুহূর্তটির মধ্যে এসে পড়ে সবই অচেনা লাগছে—আর এত অচেনা লাগছে বলেই 'একা-একা' লাগছে বেশি—যদিও তাকে ঘিরেই সব আয়োজন। আর যে সবচেয়ে চেনা, সেও, তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে 'পরপর ভাবে থাকছে'—এই অংশটি খুব সুন্দর। এত অচেনার মধ্যে সেই একমাত্র চেনাকে যখন সবচেয়ে পাশে চাইছে মন, তখন সে চিনেও চিনছে না। বোঝা যায়, নতুন বর, খানিকটা লজ্জায় আর খানিকটা যেন কিছুই হয়নি এমন স্মার্ট ভাব দেখানোর চেষ্টাতেই নতুন বউয়ের কাছে আসছে না সবাইকে দেখিয়ে। যেন দেখতেই পাচ্ছে না, এইরকম ভাব করছে। কিন্তু মেয়েটির তাতে অভিমান। এমনকী কষ্টও। তার ফেলে আসা বাড়ির কথা মনে পড়ছে। বাপের বাড়ির কথা। এখানে এই অভিমান থেকে ভাতকাপড়ের কথাটি এল। কথাটি আসছে একটি

প্রথা থেকে। মেয়ে যখন বিয়ের পরদিন বরের সঙ্গে চলে যাচ্ছে, তখন পিছনে তো মা দাঁড়িয়ে। সেই মায়ের দিকে না-তাকিয়ে, পিছনে না-ফিরে মেয়েকে একমুঠো চাল নিজের ডান কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে ছুড়ে দিতে হয় অনেক পরিবারে এমন প্রথা আছে—মা, তোমার ভাতকাপড়ের ঋণ শোধ করলাম—এই বলে, মেয়েকে বরের সঙ্গে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু মায়ের ভাতকাপড়ের ঋণ কি কখনও, কোনওদিন শোধ করা যায়? এই নতুন বউয়ের মনে সেই অভিমান জেগে উঠছে। এই প্রবল উৎসব-সমারোহের ভিতরে সে এক একাকিত্বের গর্তে পড়ে গিয়েছে। তার মনে পড়ছে, আজ ভোরে, তাকে একটি অচেনা মশারির মধ্যে জেগে উঠতে হয়েছে। কবিতাটির নাম 'বউভাত'। সেই উৎসবের বর্ণনাই চলছে সারাক্ষণ। কিন্তু বউভাত তো আজ। গতকাল রাত্রিটি তো তাকে একাকী কাটাতে হল। সেই কালরাত্রি বলা হয় যাকে। প্রথম দিন, অচেনা বাড়িতে গিয়ে, অচেনা ঘরে, অচেনা মশারির মধ্যে, আধো-ঘুম আধো-তন্দ্রায় হয়তো রাত্রি কাটল তার। ভোরের তন্দ্রা হয়তো একটু গাঢ় হয়েছিল। যেই সে ঘোর ভাঙল—মনে হল, আমি কোথায় এলাম? কবিতাটির শেষ শব্দ 'সকালবেলায়'। অর্থাৎ, আজ থেকে, নতুন বাড়িতে নতুন সঙ্গীর সঙ্গে, নতুন জীবন শুরু হবে। তবু সে ভুলতে পারবে না কোনওদিন সেই অচেনা বাড়িতে অচেনা মশারির মধ্যে রাত কাটানো, অচেনা ভোরে জেগে-ওঠা। আর সেই অচেনা লাগার অনুভব এই উৎসবের মধ্যেও ঘিরে আছে তাকে।

আমরা, পাঠকরা, আশা করতে পারি, নিশ্চয়ই আর কয়েক ঘণ্টা পরেই, যে-ছেলেটিকে 'পর-পর' লাগছিল, সে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে আপন হয়ে যাবে। এই ভয় মেয়েটির থাকবে না। এই বাড়িও সহজ হয়ে আসবে। বেশিরভাগ নারী-পুরুষের ক্ষেত্রেই তেমন ঘটে—নইলে সব পরিবারই তো ভেঙে যেত। সেই পরিবার, দাম্পত্য, সেই একত্র থাকা চলতে থাকে—কিন্তু হাজার হাজার বধূর মন থেকে কখনও মুছে যায় না, প্রথম ওই অচেনা দিনটি।

সবেমাত্র বাপের বাড়ি ছেড়ে আসা সেই হাজার হাজার নতুন বউয়ের মনের একটি বিশেষ দিক ধরে রাখল, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এই 'বউভাত' কবিতা।

এইবার উল্টোদিক থেকে একটু দেখি। যে-ঘরে বউ এসেছে সদ্যই—সেই ঘরের কথা, সেই সংসারের কথা বলছে এই কবিতা সিরিজ। এই সিরিজের নাম? হ্যাঁ, 'ঘর'।

ঘর-১
অনেক সবজি এনেছি আজ বাজার থেকে
শাকগুলো দ্যাখো কী ডাঁটো আর সবুজ
রঙের মধ্যে ছুট্টে এসো তুমি
এত সবুজ আভা আর কপালের ফোঁটা ফোঁটা ঘাম
মিলেমিশে কেমন যে হয়ে উঠছে ঘর

আজ যেন কেউ না আসে

বোঝাই যায়, কবিতাটি একটি পুরুষের লেখা। সে বাজার করে এনেছে। তাজা সবুজ, ডাঁটো এইসব শব্দে যৌবনের উপচে ওঠা খুশি—তার মধ্যে ছুটে আসছে তার নারী—এখানে ছুটে না-লিখে 'ছুট্টে' লেখা হয়েছে। কারণ, 'ছুট্টে' বলায় বালিকাভাব ফুটেছে। মেয়েটির উচ্ছ্বাস ও খুশি ফুটেছে। তার কপালের ফোঁটা-ফোঁটা ঘামে সংসারের পরিশ্রম-চিহ্ন রেখেছে—কিন্তু, সে পরিশ্রম যে অত্যন্ত সুখের, তাও গোপন নেই। এক লাইন স্পেসের পর যে লাইনটি রয়েছে, তাতে বোঝা যায়, ওদের দু'জনের কাছে, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে এই ঘর-ই সেই স্বর্গ। শেষ লাইনটি থেকে এও অনুমান হয়, এই সংসারটি হয়তো কেবল এই দু'জনকে নিয়েই। ওরা নিজেদের নিয়েই ভরে থাকবে আজ। কেমন সেই ভরে থাকা?

ঘর-৩
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রুটি তৈরি করবার
একটা মজা আছে
চাকি বেলুনের ওপর লম্বালম্বি
যাতায়াত করে ব্রোঞ্জের চুড়ির ছায়া
সেঁকতে গিয়ে ভাপ লাগে আঙুলের রোমে
আর মাঝে মাঝেই গোলমাল
আনাড়িদের যেমন হয়
'এই দেখ ওভাবে না, এভাবে'
পাকা হাতের নিমেষ ওড়ে, আর
দেখি, ফুলে উঠছে ধীরে ধীরে
নিটোল, ফাঁপা, একটা হাওয়ার গম্বু
সাদাটে এক ভরাট ফাঁকা
কপালের ঘাম চিকচিক করে
হেসে ওঠে রুটির দিকে তাকিয়ে
আর কী অবাক
রুটিও ফিরিয়ে দিতে থাকে হাসি
একটু একটু করে তার ভাপের মধ্যে দিয়ে

দু'জনে মিলে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে রুটি বানাচ্ছে। অনুমান করা যায়, ছেলেটি রুটি সেঁকছে উনুনে। মেয়েটি রুটি বেলে দিচ্ছে। বেলছে যখন, চাকি-বেলুনের ওপর লম্বালম্বি যাতায়াত করছে মেয়েটির হাতের চুড়ির ছায়া। এইরকম ছোট্ট ছোট্ট ডিটেলে ভরা সবটুকু। রুটি তৈরি করার মতো দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনাও পুরুষটির চোখে অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠছে কারণ মেয়েটিকে সে ভালবাসে। দু'জনের সংসারের এই খুঁটিনাটি জিনিসগুলো তাদের ভেতরকার প্রেম দিয়ে ভরে তুলছে এই দম্পতি। মেয়েটির কপালের যে-ঘাম চিকচিক করছে, রুটির প্রতি একটি স্বাগত সম্ভাষণ—এই মাত্র প্রস্তুত হয়ে উঠলে তুমি—তাই, এসো। আমাদের সংসারে। উল্টোদিকে রুটি যখন ফুলে উঠছে তাপে, এবং ভিতর থেকে গরম ভাপ বেরিয়ে আসছে—তা যেন ওই হাসির উত্তরে হাসি—এইভাবে নিতান্ত তুচ্ছের ভিতরে আশ্চর্যকে আবিষ্কার করা হচ্ছে। আর তা আবিষ্কার করছে এই দম্পতির পরস্পর-নির্ভরতা। একজন আছে বলেই অন্যজনের কাছে যে কোনও কাজই এত সৌন্দর্যময়।

আগের কবিতায় যে ছিল, আজ যেন কেউ না আসে। আসেনি নিশ্চয়। তাই দু'জনে মিলে রান্নাঘরে।

এরপর এই সিরিজের আরেকটি কবিতা বলি

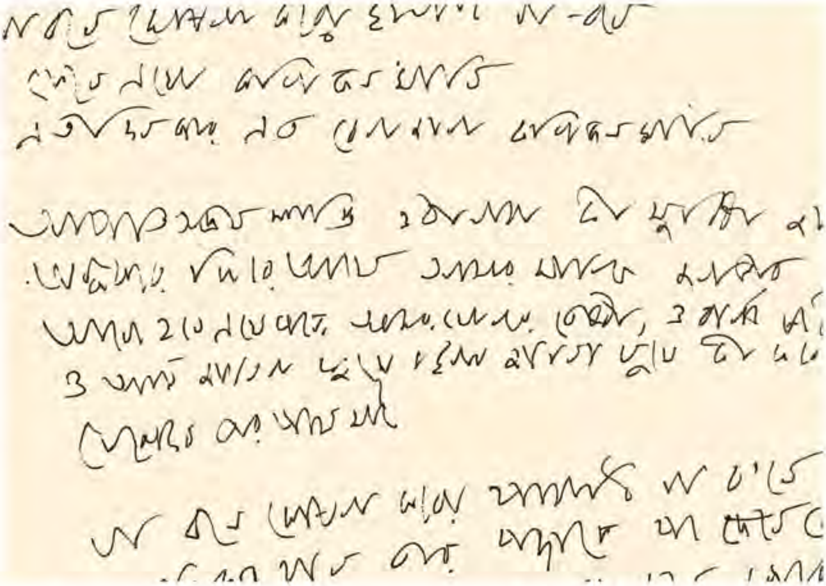
ঘর-৪
খট করে বাথরুমের ছিটকিনি খুলে
বেরিয়ে এলে
কানের লতিতে ফোঁটা ফোঁটা জল
কপালে আগুন, পরণে আটপৌরে শাড়ি

এত আলো, এখন আর বাতি লাগবে না

সারাদিন নানা সব কাজের পর মেয়েটি সন্ধেবেলা স্নান সেরে বেরিয়ে এসেছে। এত অল্প শরীর বর্ণনা, শুধু কানের লতিতে ফোঁটা ফোঁটা জল। শাড়িটা কীভাবে জড়ানো বোঝা যায়। সারা ঘর আলো হয়ে উঠেছে। তাদের দু'জনের ঘর। সদ্যস্নাতা মেয়েটিই সে-ঘরের একমাত্র আলো।

আরেকটি কবিতা দেখা যাক:

তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি
কত ভোর
এক ঘণ্টা দশ ঘণ্টা একশো বছর
খুশির এমন চাপ মনে হয় জলে ডুবে আছি



এ-কবিতা কেবল চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। জন্মের পর জন্ম কেটে যাচ্ছে যেন। এবং শেষ লাইনটি বলছে 'খুশির এমন চাপ যেন জলে ডুবে আছি'।

এইসব কবিতা খুশি-আনন্দ-সুখের কবিতা। নির্জন নিভৃতে পাওয়া সুখ। শরীরের উত্তেজনা এই কবিতার প্রেমের মধ্যে ঢুকে পড়েনি। তাই অন্য সব প্রেমের কবিতা থেকে এ কবিতা বিশেষভাবে আলাদা হয়ে আছে। শরীরকে স্বীকার করার কবিতাও লিখেছেন এই কবি। কিন্তু, আমি বিশেষভাবে তুলে আনছি তাঁর সেইসব কবিতা যা এক ধরনের নীরব, তোলপাড়হীন, শান্ত ও নিবিড় প্রেম অনুভবকে বহন করছে। এমন এক গুহ্য সাধনপ্রণালীর কথাও শোনা যায়—যখন সাধক-সাধিকা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় শীর্ষসুখে পৌঁছে যান, পরস্পরকে স্পর্শ না-করেই। কিন্তু এখানে যে দু'টি নারীপুরুষ, তারা সাধারণ দম্পতি মাত্র। কখনওই কোনও জটিল গুহ্য সাধনমার্গের যাত্রী নন। শুধু ভালবাসা, প্রেম, তাদের পূর্ণ করে রেখেছে। একটি অমৃতস্বাদ এই প্রেমের ভিতরে।

এই 'ঘর' সিরিজের শেষ কবিতাটি এবার বলব।

ঘর-৭

এত মুশকিলে পড়ে গেছি—মাসের শেষ
হাত ফাঁকা, অথচ মাইনে পেতে এখনও দু'দিন

কাঁচুমাঁচু মুখ আর চাপা হাসি
'এ মাসেও গেল-মাসের মতো—
—দিয়ে দেবে কিন্তু!'

লক্ষ্মীর ঝাঁপির থেকে বেরিয়ে
উড়ে আসছে সিকি, আধুলি
দশ পয়সা, কয়েন, দু-টাকা...

মন দিয়ে পেছন থেকে দেখি
হাঁটলে পায়ের ছাপ পড়ে কি না

সংসারের খুঁটিনাটি সুবিধে-অসুবিধের কথা আবার ফিরে এসে গিয়েছে। এবার আসছে আর্থিক প্রয়োজনের কথা। পুরুষটির খরুচে হাত, এবারও মাস শেষ হওয়ার আগেই খালি। তাই স্ত্রী-র কাছে হাত-পাতা। সংসারের এই চিত্র বাঙালির ঘরে ঘরে। এখানে সবচেয়ে কৌতুক জন্মায়—'দিয়ে দেবে কিন্তু'—এই সংলাপটি থেকে। যেন কত দিয়ে দেওয়া হয় প্রত্যেকবার! যে বলছে, সেও জানে, ফেরত পাবে না।

কিন্তু দিতে তার কুণ্ঠা নেই। তার যে আছে জমানোর জন্য লক্ষ্মীর ঘট। সিকি, আধুলি, টাকা সারা মাস ধরে জমিয়ে রাখা। সেই তার ঝাঁপি। এ কবিতার শেষ দু'টি লাইন তুলনাহীন। কবিতার যে উড়াল, তা এই দুটি লাইনে রয়েছে। মাটির দিকে তাকিয়ে দেখা—আলপনায় যে লক্ষ্মীর পা আঁকা হয়, সেইরকম পদচ্ছাপ কি পড়ছে মাটিতে? কারণ আমার ঘরের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তো এ-ই! এই মেয়েটিই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'যতদূরেই যাই' কবিতার সেই নিকোনো উঠোনে আঁকা সারি-সারি লক্ষ্মীর পা অনেকটাই অন্য ভাবে ব্যবহার হল এখানে। আর 'ঘর' নামের এই কবিতাগুচ্ছ দাম্পত্যজীবনের সুখস্পর্শের এক অপূর্ব ছবি পৌঁছে দিল আমাদের কাছে।

এই কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল ১৯৯২ সালে। কবিতাগুলো লিখেছিলেন অনুপ মুখোপাধ্যায়। সম্পূর্ণ অলঙ্কারহীন, সোজা ও সাদামাটাভাবে বলা এই কথাগুলো কবিতা হিসেবে আমাকে নাড়া দেয়, এর অন্তরের ঐশ্বর্যের কারণে। এই কবিতাগুচ্ছের ভিতরের সৌন্দর্যময় মনটিকে আমি ভুলতে পারি না। একটি নতুন দম্পতি যারা সবে মাত্র সংসার পেতেছে, টানাটানির সংসার, তবু তার মধ্যে দু'জনের দু'জনকে নিয়ে এই ভরে থাকা যেন দ্বিতীয়রহিত। কত নতুন দম্পতির মনের কথা এই কবিতা। দশদিনের জন্য হোক এক মাসের জন্য হোক বা এক বছরের জন্য—সব নতুন দম্পতিই এমন অপূর্ব প্রহরযাপন করেছে।

কিন্তু বলার কথা এই যে, কবিতাগুলো আজ আর পাওয়া যায় না। কোথাও হারিয়ে গিয়েছে এই 'ঘর' কবিতাগুচ্ছ। আর এর লেখক অনুপ মুখোপাধ্যায়? দীর্ঘদিন হয়ে গেল তাঁর কবিতা চোখে পড়ে না আর।



বাণী বসু

পঞ্চম অধ্যায়

সন্দীপন পাঠশালা

গুরুদেব কাল চলে যাবেন। আজ বিরাট করে আরতি হবে। ঠাকুরঘর আর ওপরে নেই, এখন ঠাকুর্দা-ঠাকুমার ঘরটায় ঠাকুরঘর বসেছে। ঘরটাকে আর চেনা যায় না। এখানে কোনওদিন ঠাকুরদা গুড়ুক গুড়ুক তামাক খেতেন, ঠাকুরমা আলনা গোছাতেন, ঘরে টাঙানো ফটো নামিয়ে কাচ মুছছেন তো মুছছেনই, কিংবা তাক থেকে বই নামিয়ে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছেন তো দেখছেনই, হুঁকো নিয়ে এসে ঠাকুরদার হাতে দিলেন, মাথা থেকে ঘোমটা খসে গেছে, কীরকম ছেলেমানুষের মতো হেসে বললেন—পুনু যখন ইংরেজি শিখবি আমায় একটু একটু করে শিখিয়ে দিবি দাদা, আমি ইংরেজি নভেল পড়ব বুঝলি? সেই সমস্ত দৃশ্য, স্বর ঘরখানাতে ঘুরে বেড়াত, বড় খাটটাতে দাদারা এসে শুতো কখনও কখনও, সেইসব খেয়ালের শোয়া, হুঁকোর গুড়ুক, আলনা গুছোনো, পাকা চুলের ওপর থেকে ঘোমটা খসে যাওয়া সব পমদিদি বালতি ন্যাতা করে মুছে মুছে দিয়েছে। পুনপুন মাঝে মাঝেই ঘরখানার সামনে দিয়ে ঘুরে ঘুরে যায়। একটা জিনিস দেখতে চায় সে। ঠাকুরদা মারা গেছেন, খাটটা শূন্য, কিন্তু বাবা খাটের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বাবার মুখে কোনও ভাব নেই, কেমন যেন। কেমন? ঠিক যেন বাবা, পুনপুনদের বাবাও তাঁর বাবার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন। বাবার সেই অদ্ভুত নেই হয়ে যাওয়া এই ঘরের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। পুনপুনের ভয় করত খুব, আবার কেমন একটা ব্যাখ্যার অতীত আকর্ষণ, সেই জিনিসটাও এখন ঘরটা থেকে উধাও হয়ে গেছে। পুনপুন বা বুবু কেউই এটাকে মেনে নিতে পারছে না।

জটাঅলা সব ব্রহ্মচারীদের ছবি একটা বড় চৌকির ওপর। দেয়ালেও এদিক-ওদিক অনেক ছবি। প্রত্যেকটা থেকে মালা দুলছে। মালার ফুলের গন্ধ রাশি রাশি ধূপের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে। ঘর জুড়ে কত যে আয়োজন, কত কাণ্ড! শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর, খন্তাল, চামর, প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ, কপ্পুরের গোল মতো দীপ। লুচি, ভাজা, মিষ্টি রাবড়ির ভোগ ভারে ভারে আসছে, নিয়ে আসছেন পারুলদি, মেনিদি, টমদিদি। সব সাদা কালো পাথরের থালায়। যত্ন করে আলপনার মতো করে সাজিয়ে দিচ্ছে ওরা চারিদিকে। আরতি করতে এসেছেন এক ভটচায্যি মশাই। ইনি ঠাকুরের গুরুভাই। সবাই বলছে ডাক্তারবাবুর অনেক ভাগ্য যে ইনি আজ পুজো করতে রাজি হয়েছেন।

সারা ঘরে লোক গিসগিস করছে। পুটপুটদিদি আর টমদিদি দু দিক থেকে শাঁখ বাজাচ্ছে মাঝে মাঝে, একেকটা আরতি শেষ হচ্ছে আর পমদিদি সবাইকার কাছে আলোর তাপ ধরছে। কী বলো তো? আরতি মানে হল ঠাকুর ভগবানকে আদর করা হচ্ছে। উনি এসেছেন, ওঁকে শাঁখের মধ্যে করে পবিত্র গঙ্গাজল দিয়ে পা ধুয়ে দেওয়া হল, তারপর পাটকরা নতুন ছোট্ট গামছা ঘোরানো হচ্ছে, তার মানে পা মুছিয়ে দেওয়া হল, প্রদীপ দেখিয়ে ওঁকে ঘরে বসানো হল, ভগবানদের ওখানে তো ইলেকট্রিকের আলো নেই! এ ঘরের বাল্বও খুলে নেওয়া হয়েছে। তিনটে প্রদীপের কী মানে তা পুটপুটদিদি তাদের বলতে পারেনি। চামর দোলাচ্ছেন এখন গুরুভাই, বাঁ হাতে পেতলের ঘণ্টা নাড়ছেন, আর ডানহাতে চামর দোলাচ্ছেন। কী সুন্দর চামরটা! রুপোর হাতল তাতে নানা কাজ করা, সাদা রঙের দাড়ির চুলের চামর। কোন সাধু তাঁর দাড়ি তাদের চামরের জন্যে দিয়েছেন কে জানে। এই আরতির কাজটা খুব শক্ত। কিন্তু গুরুভাইদের কাছে কিছুই কিচ্ছু না। গোড়ালি দুটো তালে তালে তুলে তুলে কেমন নেচে নেচে আরতি করছেন গুরুভাই। কাঁসর বাজাচ্ছেন অতুলকাকা নস্যিদানি, ঘড়ি বাজাচ্ছেন ঢং ঢং আরেকজন ষণ্ডা মতন শিষ্য, এঁর দেখা আজই প্রথম পাওয়া গেল। গুরুঠাকুর সোজা সটান দাঁড়িয়ে আছেন, হাত জোড়, দু পাশে দুগগা মাসিমা আর পারুলদি।

কতক্ষণ আর আরতি হবে? পুনপুনের পা ব্যথা করছে, বুবুর গরমে হাঁফ ধরছে। ভেতরে ভেতরে খুবই অনুতপ্ত এ জন্য তারা। কারো কাছেই স্বীকার করবে না কক্ষনো। নিজেদের কাছেও না। ছি ছি। আরতির মতো পবিত্র জিনিস হচ্ছে, আর তারা কি না কষ্ট পাচ্ছে?

যাক, শেষ পর্যন্ত চামর দুলিয়ে দুলিয়ে ব্রহ্মচারীদের, দেয়ালের ঠাকুরদের সবাইকে হাওয়া করে করে আরতি শেষ হল। শাঁখের ভোঁ ভোঁ, ঘড়ির ঢংঢং, কাঁসরের ক্যানক্যানিয়া, ঘণ্টার নুংনুং সব ধীরে ধীরে থেমে গেল। সবাই হাঁটু গেড়ে বসে, তারপর উপুড় হয়ে পেন্নাম করছে। ঠাকুর একেবারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন, বাবাও লম্বা হয়ে উপুড় হলেন, অনন্ত জ্যাঠামশায় ওইরকম পেন্নাম করতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলেন, আবার উঠে বসে উপুড় হলেন, পুনপুন বুবুর দিকে তাকাল না, তাকালেই হেসে ফেলবে। প্রণামের মন্ত্র বলছেন ভটচায্যি মশাই। তারপর নিশ্বাস ফেলে সবাই উঠল। ঠাকুরের ভোগ হবে। সবাই বাইরে চলে এল। পাঁচ মিনিট পরে আবার দরজা খুলল, সবাই গিয়ে আবার যে যার মতো বসল। পুনপুনরা অবশ্য এখন জানে ঠাকুরদের দৃষ্টিভোগ। যেমনি তুমি দরজা বন্ধ করে চলে আসবে, অমনি ওঁরা প্যাটপ্যাট করে চেয়ে দেখবেন এরা কী কী দিয়েছে। ফুলকো



ফুলকো লুচি, বাঃ, লম্বা লম্বা ল্যাজ ওয়ালা বেগুনভাজা চমৎকার, সোনালি আলুর দম উসসস। রাবড়ি নাঃ আর লোভ সামলানো যাচ্ছে না। কিন্তু ঠাকুরদের লোভ করে লাভ নেই, জিব, টাকরা, এসব আছে কি না কে জানে, কিন্তু খিদে নেই, শুদ্ধু চেয়ে চেয়ে দেখে সবশুদ্ধু প্রসাদ করে দিয়ে যে যার ফটোতে ফিরে যাবেন।

এইবার শুরু হল ভজন।

১) ভবসাগরতারণ কারণ হে

হৃদিনন্দন বন্ধনখন্ডন হে।

এমন হে হে করা বুবুর একেবারেই ভাল লাগে না। হে হে করে তো নাম না জানা লোকেদের ডাকে। গানের মধ্যে এমন হে হে কেন রে বাবা? বাবার গলায় এই গান শুনতে চায় না সে, শ্মশানবাসিনী শ্যামার গান এরচেয়ে অনেক ভালো লাগতো। এটা বাবার গান নয়, পুনপুনও ভাবে। এটা নস্যিঅলাদের গান। তা সে গান যদি বা শেষ হল, প্রসাদ বিতরণ করে পুজোর শেষ করো! তা নয়, শুরু হল—

২) অপরূপ শ্রীগুরুরূপ, এ কী টান রে বাবা রূপো বলে, সবাইকার গলা আবার সুরে বলে না, তবু গাইতে হবে, রূপো তো নয় এক চিৎকার। বুবুর কেমন গা গুলোয়, পুনপুনের মাথা কেমন করে, কেন বাবা বলছেন না—অতুল, অনন্তদা চুপ করো চুপ করো, গাইতে হবে না! অন্য সময়ে তো সুরে গন্ডগোল হলে বাবা হুংকার দিয়ে ওঠেন। তারও পরে গুরুদেব ধরলেন—

৩) হরি সে লাগি রহো রে ভাই। একা একা গাইতে লাগলেন, সবাই দোহারকি দিতে লাগল। গুরুদেবের গলা ভীষণ গম্ভীর। যেন ভয় ধরানো। বাবা বলেন কী গলা! সাধনে অমন গলা হয়েছে। বিবেকানন্দরও অমন গলা ছিল। এঃ, এইরকম গলা হলে তো বিবেকানন্দ ভাল নয়! এইসব নানা অকথা কুকথা ঘুরপাক খাচ্ছে দু'জনের মগজে। কখন এই ভজন শেষ হবে? তারা রাত আটটার মধ্যে খেয়ে নেয়। তার চেয়ে বেশি রাত হলে, মাঝে মা বিস্কুট কি দানাদার কি কিছু একটা দ্যান। কোথায় সেই মা? অনেক দূরে ম্লান প্রতিমার মুখ নিয়ে বসে আছেন। ঘর অন্ধকার, শুধু দীপের আলো, সে আলোয় মায়ের মুখ ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। বাবাই বা কোথায়? বাবার দু'চোখ বোজা, গলা ঠাকুরের চেয়ে অনেক সুন্দর। বাবা গাইছেন—তেরা বনত বনত বনি যাই। দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা নামছে। এই বাবাকে তারা চেনে না তো! বাবাকে কখনও কাঁদতে দ্যাখে নি তারা, ঠাকুরদা মারা গেলেও না, ঠাকুমা মারা গেলেও না। দুঃখ জমাট বেঁধেছিল মুখে, কিন্তু কান্না? কখনও না। পমদিদি পিঠ সোজা করে পদ্মাসনে বসে আছে, টমদিদি হাতে তাল দিতে দিতে হেলছে দুলছে, সু-দাদা খঞ্জনি বাজিয়ে গাইছে, হরিসে লাগি রহো রে ভাই! পুটপুট পর্যন্ত চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে তালে তালে দুলছে। এরা কারা? তাদের

আজীবন চেনা সেই বাবা, মা, দাদা দিদিরা? কত ভাব, কত আদর, বকা ঝকা, কত যত্ন আত্তি। পুনপুন দেখল ঠাকুরদা যেমন চলে গিয়েছিলেন, ঠাকুমা যেমন চলে গিয়েছিলেন চোখ বুজে বুজে, আজ বাকি প্রিয়জনেরা সব সার বেঁধে মিছিল করে তেমনি চলে যাচ্ছে। দু'রকম যাওয়া, ঠিকই, কিন্তু যাওয়াই। কেউ আর তাদের নেই। কেউ না। এক পৃথিবী অন্ধকারের মধ্যে সে আর বুবু হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট ভূখণ্ডের ওপর। চারদিকে উত্তাল জল ফোঁস ফোঁস করছে—হরিসে লাগি রহো রে ভাইইই! লাফিয়ে উঠল জল, এই তাদের ছোঁবে ছোঁবে।—তেরা বনত বনত বনি জাই, পুনপুন আর এই ভয়ানক ভয় সহ্য করতে পারছে না। বুবুর দিকে তাকিয়ে দেখল বুবু ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছে। ঘুমেই তো? না অন্য কিছু? সেই জল কি বুবুকে গিলে নেবে?

ঠাকুরের ডান হাতের মুঠি উঠছে, বিদ্যুৎগতিতে নেমে এল। দুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌। মুঠিটা ভেঙে পড়েছে বুবুর পিঠের ওপর, একেবারে মেরুদণ্ডের মধ্যিখানে। বুবু জানে না সে কোথায় আছে, কী হয়েছে, ককিয়ে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পুনপুনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। পারুলদি আর টমদিদি উঠে এসে তাদের দু'জনকে নড়া ধরে বার করে দিল—ঠাকুরঘরে ঘুমোতে হয়? টমদিদি ফিসফিস করে বলল—যাও শুয়ে পড়ো গে যাও।

দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে সেই সংকীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর শুয়ে রইল অতঃপর। পুনপুনের ভয় বুবু যদি ভেসে যায়, বুবুর ভয় পুনপুন যদি ভেসে যায়। পরস্পরকে বাঁচাতে তারা আর কিছু না পেয়ে, শুধু হাত দিয়ে দু'জনে দু'জনকে আঁকড়ে ধরে থাকে। তলিয়ে গেলে একসঙ্গে যাবে।

দেবহূতি ছাড়া পেয়ে এসে দেখলেন তাঁর ছোটদুটি গলা জড়াজড়ি করে প্রাণপণে চোখ বুজিয়ে শুয়ে রয়েছে। জানলা দিয়ে আসা আলোতেও তিনি বুঝতে পারলেন তাদের মুখ ভয়ে সাদা, দুঃখে কালো, লজ্জায় লাল হয়ে রয়েছে। আস্তে বুবুর পিঠে হাত রাখলেন তিনি—বিদ্যা!

জবাব এল না।

আন্দাজে লাগার জায়গাটার হাত বোলাতে বোলাতে ডাকলেন—বিদ্যা!

জবাব এল না।

—বড্ড লেগেছে বাবা? আমি মলম মালিশ করে দিচ্ছি, দেখো এক্ষুনি আরাম হবে।

মলম নিয়ে এসে ফ্রকের পিঠ খুলে যেই হাত রাখতে গেলেন, বিদ্যা এঁকেবেঁকে সরে গেল। পুনপুনকে আঁকড়ে ধরলো আরও জোরে।

—চল তোদের খেতে দিই, পাব-ন। খেয়ে এসে ঘুমিও বাবা।

জবাব এল না। কেউ একচুলও নড়লো না সরলো না।

নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন দেবহূতি। বাইরে রাস্তার গ্যাসের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। আজ গুরুপূর্ণিমা, কিন্তু আকাশ কি মেঘে ঢাকা? তিনি কোনও চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন না। চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার। কত কত অন্ধকার পার হয়েছেন, আরও কত পার হতে হবে? কোনওদিন কি আলো ছিল? আলোয় কি পৌঁছোনো যায়? শরীর ভেঙে পড়ছে। দাঁড়াতে পারছেন না আর, প্রায় ঊনিশ-কুড়ি দিন ধরে এই কঠিন সেবা শুশ্রূষা, এতগুলি লোকের। তাঁকে বোঝে, তাঁর কথা শোনে এমন কেউ নেই, অথচ তিনি সর্বনাশ দেখতে পাচ্ছেন। জলস্রোত! জলস্রোত! কোনওক্রমে সেই জলস্রোতে পিঠ দিয়ে উদ্দালকের মতো শুয়ে পড়লেন তিনি। যদি বাঁধ দিতে পারেন। হাবুডুবু খাচ্ছেন, মাটি ঢুকে যাচ্ছে নাকে মুখে, মাটি কাদা, নিশ্বাস নিতে পারছেন না।

গুরুদেবের নৈশাহারপর্ব শেষ হয়ে গেল। প্রসাদ বিতরণপর্বও শেষ। যারা যাবার চলে গেল। তখন মনোরমা বললেন—দেবুকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছি না। পুঁটি দ্যাখ তো কোথায় গেল?

ঋতি এ ঘর ও ঘর খুঁজে দেখল তিনজনে শয়ান। মা এবং তাঁর সন্তান। পৃথিবীর আদিমতম মানবপরিচয়। সে একটু নাড়াল মাকে।—মা, ও মা! চোখ মেললেন না দেবহূতি। তখন ঋতি শোর তুলে ছুটে গেল সিঁড়ির মুখে—বাবা, বাবা, সু-দাদা, শীগগীরই, মা সাড়া দিচ্ছেন না।

দেবহূতি জীবনে এই প্রথম অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

পুনপুন, তোর মনে আছে—আমরা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলুম সেই রাত্তিরে। জীবনে সেই প্রথম বোধহয় সংকটের মুখে আমি একফোঁটাও কাঁদিনি। ভেতরটা কীরকম পাষাণ হয়ে গিয়েছিল। পাষাণের ভেতরে কি হাওয়া বয়? বয় না, কিন্তু থাকে। আমার ভেতরে হাওয়া স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই যেমন হামাগুচি গোহেইয়ের গল্পে ছিল না? সমুদ্র অনেক দূরে সরে গেছে, হাওয়া পড়ে গেছে, প্রচণ্ড গুমোট শ্বাস নিতে পারা যাচ্ছে না! হামাগুচি তাঁর পাহাড়ের ওপরের বাড়ি থেকে বুঝলেন সমুদ্রে আসছে, সুনামি এবার সমস্ত ভাসিয়ে নেবে। তিনি তাঁর গোলাঘর জ্বালিয়ে দিলেন, যাতে সৈকতে আমোদে মত্ত তাঁর গ্রামবাসী আগুন দেখে ছুটে আসে। শেষ মানুষটি যখন পাহাড়ের ওপর পা রাখল, সবাই প্রাণপণে জল ঢালছে জ্বলন্ত গোলায়, হামাগুচি বললেন, ফিরে তাকাও, ওদিকে দ্যাখো। সবাই দেখল, মত্ত সমুদ্র অবিশ্বাস্য উচ্চতায়, ভৈরব বেগে ছুটে আসছে। মায়ের অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ওই বিপদসংকেত। আমরা বুঝেছিলুম ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে।

আমি মার কোলপোঁছা, এমনিতেই ছেঁয়ো পেতনি বলতো সবাই, এক মিনিট মায়ের কাছছাড়া হতে চাইতুম না, বিশেষ করে অসুখ থেকে পুনর্জন্ম হবার পর। সেই আমি মায়ের কাছে থেকে সরে গেলুম, মায়ের স্পর্শ প্রত্যাখ্যান করলুম, তুইও তাই। আমিও যেমন, তুইও তেমন, জীবনের প্রায়রিটি হলেন মা। ওই শান্ত মুখে, মৃদু চোখে, চুলের ফেরে, শাড়ির আঁচল মাথায় দেবার কায়দায় আমাদের সমস্ত জীবন ওতপ্রোত ছিল। নাকি মা প্রায়রিটি নয়, আমরা তিনজনেই আসলে তিনজনের প্রায়রিটি।

মাকে সে দিন আমরা ফিরিয়ে দিয়েছিলুম চরম অভিমানে। আমরা জানতুম না, জানতে চেষ্টা করিনি মায়ের কষ্ট, তাঁর দিশাহারা অবস্থা। তাঁরও তো সবই চলে যাচ্ছিল। তিনি যাদের ওপর নির্ভর করেছিলেন তারা কাঁধ ফিরিয়ে নিয়ে চলেই তো যাচ্ছিল, তাঁর সমস্ত জীবন সাধনা পায়ে দলে যাচ্ছে এ চেতনা তাদের কারো ছিল না। বাবার না, পম টম ইন্দ্র সুযযি কারো না। এতদিন তারাও নির্ভর করেছিল তাঁর ওপরে। তিনি সে দায়িত্ব ষোল আনার জায়গায় আঠানো আনা মিটিয়ে ছিলেন। কিন্তু জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেবার সময়ে কেউ তাঁর পরামর্শ নিল না। শ্রদ্ধা-পুলক সিভিল ম্যারেজ করে এসে তবে তাঁকে জানাল, গুরু নির্বাচন করার আগে, মন্ত্র নেবার আগে এ বিষয়ে তাঁর মতামত কোনো ছেলেমেয়ে জানতে চাইল না। বেশি কথা কী, তাঁর স্বামী যাঁর খামখেয়ালিপনা, সংসারবুদ্ধিহীনতা ও প্রবল প্রবৃত্তির জন্য তাঁর সারাটা জীবন ছেদহীন কষ্টে কেটেছে, তিনি পর্যন্ত বড় ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে শলা পরামর্শ করে তাঁকে তুচ্ছাতিতুচ্ছের মতো ডিঙিয়ে গেলেন, যদিও সে সিদ্ধান্তের শিকার হলেন একমাত্র তিনিই। তাঁরই সবচেয়ে পরিশ্রম, উদয়াস্ত অমানুষিক খাটুনি যার মধ্যে এতটুকু রস ছিল না। এবং তাঁর ছোটগুলি? অংশু এঁটো হাতে গৃহত্যাগ করে গেল, বিদ্যা পাবন জেগে জেগে নিঃসাড় হয়ে রইল। তিনি যে তাঁর হাতের ছোঁয়া তাদের জন্য মৃতসঞ্জীবনী বলে জেনেছিলেন। সবই ভুল, পুরস্কারহীন, প্রত্যাশাহীন এবং চূড়ান্ত অর্থহীন।

পুনপুন, মায়ের সেই শূন্যতা-অনুভবের ক্ষণ আর তার সঠিক প্রকৃতি আজ এখন তো বুঝতে পারিই। কিন্তু তখনও একরকম করে বুঝেছিলুম। দেবহূতিরা আর বিদ্যারা কোথাও আলাদা, কিন্তু কোথাও কোথাও এক।

(ক্রমশ)

ছবি : ঈলীনা বণিক


ছোট, বড় সবার।
সব occasion-এর জন্য বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
95515
Rs 375/-
Genesis 2880
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street 033 22861510/11 Free School Street (Opp. Fire Brigade) 033 22861506

চিত্রলেখা চৌধুরী

প্রাচীনার নবীনবেলার কাহন

গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি যাব। জিনিসপত্র গোছানো হচ্ছে। বাজারে বেরনোর আগে বাবার কাছে রোজ মা'র আড়ালে গুজগুজ—ছোটমামিমা তালপাটালি বড় ভালবাসে আর জয়নগরের মোয়া। বাবা চুপ করে শোনেন, আর মাকে খেপিয়ে বলেন মাঝে মাঝে—এই খোট্টার দেশের মেয়েকে কেন যে বিয়ে করেছিলাম! সামান্য মোয়া আর তালপাটালি, তাই নিয়ে এত? আচ্ছা বলো, বিয়ে হওয়া অবধি ইস্তক জামাইকে তো তত্ত্ব বলে কিছু পাঠাল না। এবার সঙ্গে একটা ভাল দেখে ভাগলপুরি গরু পাঠাতে বলো। বেশ সরেস দুধ দেবে।

আমি কল্পনা করতাম মা আর আমরা ভাইবোন কলকাতা ফিরছি ট্রেনে করে, সঙ্গে একটা শিংওয়ালা বড়সড় গরু। ট্রেনে তার বসারই বা জায়গা কোথায় আর শোবই বা কোথায়? তবে কি ট্রেনের বাথরুমের কাছে বেঁধে রাখা হবে তাকে?

সেসময় সরলতার সময়, না নির্বুদ্ধিতার সময়—জানি না। পরে কবে যেন জানতে পেরেছিলাম, ট্রেনে পশুপাখিদের নিয়ে আসতে হলে তাদের জন্য আলাদা কামরা আছে। সেখানে তাদের বুক করে দেওয়া যায়। যখন এই খবরটা এসে পৌঁছলো, তখন আমার আর সে বয়স নেই যে, পারলে বড়দের কাউকে বলি—

আমায় রেলের সেই কামরাটা দেখতে নিয়ে যাবে? পশুপাখিদের সেই কামরাটা কি নোয়ার আর্ক-এর মতো? তা হলে মাঝে মাঝে ব্রিজ থেকে ট্রেন যখন অ্যাক্সিডেন্ট করে নদীর জলে পড়ে যায়, সেই কামরার সেটা কি ডুবে যায় জলের ভেতর? নাকি জলের মধ্যে ভেসে থাকে নোয়ার আর্ক-এর মতো? কেবল ভেতর থেকে শোনা যায় চ্যাঁ, ভ্যাঁ, বকবকম, হাম্বা হাম্বা ডাক!

বাবা কেন, আজও আমরা ভাগলপুরি গরু কথাটা ভুল করে বলি। শব্দটা আসলে 'ভাওয়ালপুরি'। ভাওয়ালপুর যদ্দুর শুনেছিলাম উত্তর ভারতের, সম্ভবত পাঞ্জাবের একটা জায়গা। সেখানে বড় বড় শিংওয়ালা দুধেল গোরু পাওয়া যায়। তার সঙ্গে আমাদের বিহারের ভাগলপুরের কোনও সম্পর্ক নেই।

ট্রেনে চেপে যাচ্ছি। আমাদের বাড়ি এমনিতে যতই রক্ষণশীল হোক না কেন, মা যখনই মামাবাড়ি যেত, সঙ্গে যেতাম আমরা ছোটরা। বাড়ির বউয়ের অভিভাবক বা আব্রুরক্ষক কোনও পুরুষ-আত্মীয় সঙ্গে আসতেন বলে মনে পড়ে না। হতে পারে পুরুষদের ব্যস্ততা বা গেঁতোমি! পুরুষের কুঁড়েমির থেকে তো বড় সতীন মেয়েদের আর কিছু নেই—সে নিশ্চয়ই আমার সব পাঠিকারাই জানেন।

ট্রেন চলছে। কিছুক্ষণ পর জানলার হাওয়ায় কখন খসে গিয়েছে মা'র মাথার ঘোমটা। আর আমরা ছোট ভাইবোনেরা জানলার ধারের সিটটা নিজেরা নিজেদের মধ্যে মিউজিক্যাল চেয়ার চালাচ্ছি। হঠাৎ এক মাঝবয়সি শীর্ণকায় ভদ্রলোক এসে আমাদের পাশের একটা খালি সিটে বসলেন। আর অমনি মা চমকে ওঠা হাতে মাথায় ঘোমটাটা তুলে দিল।

কে ভদ্রলোক বুঝলাম না। বুঝলাম মা'র পরিচিত। বাপের বাড়ির দেশের লোক মাকে বললেন,

—মধ্যে অনেকদিন আসোনি?

মা নিচু গলায় উত্তর করল,

—না, আসলে ওদের ইস্কুল-টিস্কুল!

—ক'টা ছেলেমেয়ে তোমার?

মা আমাদের দেখাল। বলল,

—এটা একটা মামা, প্রণাম কর।

আমরা চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনি সামলে একে একে প্রণাম করলাম।

ভদ্রলোক অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন,

—এই যা, ওদের সঙ্গে দেখা হবে তো কিছু ভাবিনি। টফি, লজেন্স কয়েকটা আনতে পারতাম মনে করে!

তখন চলন্ত ট্রেনের মধ্যে এখনকার মতো ফেরিওয়ালাদের অত চল ছিল না।

ভদ্রলোক আক্ষেপ করেই বসে রইলেন বাকি রাস্তাটুকু। তারই মধ্যে মাকে বলতে শুনলাম,

—বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ দেবেশদা। কি শরীর খারাপ?

ভদ্রলোক ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লেন,

—তেমন জুতের নেই।

—ডাক্তার-বদ্যি দেখাচ্ছ?

—দেখাচ্ছি। এই নিয়ে তিনবার বদলালুম।

ফল তো তেমন হল না।

জানি না কোন সাহসের জোরে মা বলল,

—তেমন হলে কলকাতায় এসো। অনেক বড় ডাক্তার আছে। ওদের বাবা নিয়ে যাবেন। দেখিয়ে আনবেন।

স্টেশন এসে গেল। আমরা বাক্সপেটরা সামলে হইহই করে



নেমে পড়লাম। ছোটমামা নিতে এসেছিল স্টেশনে। সঙ্গে টাঙাগাড়ি ভাড়া করে।

তারপর কয়েকদিন হুল্লোড় করে কেটে গেল। সারাদিন দাপাদাপি, ছুটোছুটি। আমাদের সঙ্গে জুটে যেত আমাদের মামাতো ভাইবোনেরা। বিশাল বাড়ি, বড় উঠোন, ইদারা দেওয়া। সেটা ঘিরে ঘিরে আমাদের খেলা চলত।

দুপুরবেলা হলেই শার্সিপাল্লার জানলা বন্ধ করে খাটে ঘুম পাড়ানো হত জোর করে। আপত্তি করলে নানাভাবে বোঝাত বড়রা।

—লু আসবে, এখন বেরিও না। আর আমি ভাবতাম লু বুঝি কোনও অদৃশ্য আত্মা। যেমন ঠাকুমার মুখে শুনেছিলাম নিশি ডাকলে যেতে নেই।

কে নিশি? কোত্থেকে ডাকবে? কিচ্ছু জানি না। পরে যখন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার গল্প পড়লাম, যার বাঁশির ডাকে সব বাচ্চারা চলে এল দল বেঁধে, ভেবেছিলাম নিশি বুঝি তেমনই কেউ একটা, যে কোনও এক অজানা ডাক দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যায় ঘুমন্ত শিশুকে।

পরে যখন বৈষ্ণবপদাবলি পড়ি, তখন বুঝেছিলাম আমাদের দেশেও এক হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা ছিল। যার বাঁশির সুরে বেলা পড়লেই খুরে খুরে ধুলো উড়িয়ে বাড়ি ফিরত গরুর পাল। আর রাত্তিরে সেই হত নিশি, যার অজানা ডাকে স্বামীর পাশ থেকে নিঃসাড়ে উঠে যেত এক নীল শাড়ি পরা গয়লা বউ।

দুপুরের আঁধারঘরে আলো ঢুকছে চুরি করে, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে। ঘুঘুর ডাক এক নাগাড়ে, মাঝে মাঝে বড় বড় বোলতার আওয়াজ। ঘুম আসছে না, তবু জোর করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছি লু আসবে সেই ভয়ে।

শুনলাম বড়মামিমা ফিসফাস করে মাকে বলছে,

—দেবেশটার একটা খারাপ খবর আছে শুনেছিস?

মা'র গলা পেলাম,

—কী? ট্রেনে দেখা হল, বলল না তো!

—ভুগছে বহুদিন। শুনছি তো ক্যান্সার।

মা'র গলা পেলাম না। কিছুক্ষণ পর নাক টানার আওয়াজ পেলাম। মা কাঁদছে। আর বড় মামিমার চুড়ির শব্দ, মা'র মাথা বেয়ে বুলিয়ে বুলিয়ে নামছে।

বন্ধ দরজার বাইরে লু? নাকি নিশি? এখুনি হয়তো টেনে নিয়ে যাবে আমার ঘোমটা খসা মাকে।

আমি জোর করে চোখ বন্ধ করে বালিশ আঁকড়ে পড়ে রইলাম বিছানায়।



র‍্যান্ডম, যায়িছে, ভাবনা লোফালুফি

মেয়েদের ব্যাপারটা জানি না। কেমন ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করা উচিত, এ-বিষয়ে তাদের উপদেশ দিতে আমি অপারগ। আন্দাজে বলতে পারি, ভাল দেখতে আর বড়লোক ছেলেদের সঙ্গে, আবার কী? ছেলেদের কেমন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা উচিত? তাও, টাক চুলকে বলতেই হচ্ছে, মালুম নেহি। আন্দাজ : ভাল দেখতে আর বড়লোক মেয়েদের সঙ্গে, আবার কী? সেক্স অ্যাপিল থাকলে দুরন্ত বোনাস। কিন্তু ছেলেদের কেমন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা উচিত নয়? কাদের দেখলেই চোঁ-চাঁ চম্পট মাস্ট? হ্যাঁ, এ-বিষয়ে ক'খান কথা বলার আছে। ওয়ার্নিং হিসেবে কয়েক টাইপ মেয়ের কথা নীচে দেওয়া হল। লক্ষণ মিলিয়ে দেখে, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালান।

বজ্র-এঁটুলি

এত পাগলের মতো ভালবাসে, পারলে বাথরুমেও সঙ্গে যায়। প্রেমিক ও প্রেমিকা কবদাঁত ও চুয়িংগামের মতো সম্পর্ক রাখবে, প্রত্যাশা পোষে। ওর জীবনে আপনি ছাড়া কিচ্ছু নেই। কিচ্ছু না। ও ভাবতেই পারে না, একবার অফিসিয়াল হাত-ধরাধরি হয়ে যাওয়ার পর, আপনার জীবনে আর কিচ্ছু থাকতে পারে। আপনি একলা সিনেমা দেখতে যেতে পারেন না, বন্ধুর বাড়ি যেতে পারেন না, পকেটে হাত ঢুকিয়ে গলি বেয়ে হাঁটতে পারেন না, আনমনে বসে বই পড়তে পারেন না। আপনার সব বন্ধুকে ও বন্ধু করে নিয়েছে, আপনার পছন্দকে নিজের পছন্দ করে নেওয়ার তাগিদে গাছ-আঁতেল সিনেমায় ঢুকেছে, আপনার অফিস শেষ হওয়ার একঘণ্টা আগে থেকে উল্টোদিকের ফুটপাতে উৎসুক মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পিসেমশাই মারা গেছেন বলে আপনি দেখা করতে পারবেন না জেনে একফাঁকে নিমতলায় গিয়েও আপনার সঙ্গে চোখাচোখি করে এসেছিল। প্রথম প্রথম আপনি ভাল্লাগায় শিরিয়ে উঠতেন। এমন নিবেদন! এতটা আমূল সমর্পণ! একটা মুহূর্তও আপনাকে ছাড়া কিছু ভাবে না! ফোন করলেই বলে, এক্ষুনি তোমার চটির কথা ভাবছিলাম, ছিঁড়ে এসেছে, না? দ্বিতীয় দ্বিতীয় আপনার একটা গা-ছমছমে ভাব হয়েছে। যেদিন বললেন, 'আজ বড্ড টায়ার্ড, বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমোব', চটকা ভেঙে আঁতকে দেখেন, কখন এসে পাশে চেয়ারে বসে মুগ্ধ চোখে আপনার ঘুমন্ত মুখ নিরীক্ষণ করছে। সকালে আপনার ঘুম ভাঙে ওর ফোনে। পায়খানা করা ও অফিস মিটিং-কে সামান্য ছাড় দেয়, খান পঁয়ত্রিশ এসএমএস করে শুধু। লাঞ্চের সময় ঠিক করে খেয়েছেন কি না, কলিগের টিপিনবাক্স গেঁড়িয়ে লেবুর আচার বা রগরগে ডিম মেরে দিয়েছেন কি না, ডেলি রিপোর্ট দিতে হয়। অফিস শেষ হল মানে, আপনাদের কম্পালসরি অ্যাপো। যদি বলেন, 'আজ আর দেখা করব না, এমনিই', বা, 'একটা নাটক দেখতে যাব, একলা', স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। নরম চোখে তক্ষুনি টলটলে জল এসে যায়। ব্যাপারটা বুঝেই উঠতে পারে না। প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্ত আপনারা দুই তিলের নাড়ুর ন্যায় একসঙ্গে চিপকে থাকবেন না, এটা কী করে ভাবতে পারলেন? বন্ধুর বাড়ি যাবে? কে, দেবাশিস? হ্যাঁ চলো না, যাই। আমি তো চিনি ওকে। এতক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছো, কী ভাবছ গো? সিকনি আড়াল করছ কেন? আমার কাপড়ে মোছো না। আমি তো নিজেকে তোমার কাছে বিলিয়ে দিয়েছি নিঃশেষে, তুমি দাওনি? এ মেয়ে আপনার ঘাড়মোড় আঁকড়ে প্রেমের বস্তা পরিয়ে দিয়েছে। কোমল গিঁট্টু মেরেছে ইস্পাত-আঁটন। এভাবে আপনার কাছে নিজেকে নিঃশর্ত উৎসর্গ কেউ করবে না, কেউ আপনার প্রতিটি ঘামবিন্দুর জন্য এক গেলাস করে চিনির পানা বানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না জীবনের মোড়ে মোড়ে, আবার আপনার সমস্ত নিভৃত কণা কেউ এমন নির্মম কাটারি দিয়েও কাটবে না, আপনার নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের মধ্যিখানে কোনও তাপস সেন ফেলতে পারবে না এমন রাক্ষুসে শ্বাসরোধকারী থাবাময় ছায়া।

শনিবার বাঁকুড়া

এক মহাপুরুষ সারা হপ্তা কলকাতায় অজস্র বখেড়া পাকিয়ে একশো লোককে চটিয়ে দুশো হ্যাঙ্গাম বাঁধিয়ে, শনিবার বাঁকুড়া ধাঁ দিতেন। বাবার জন্যে মন কেমন করছে বলে। সেখানে দিন দশ কাটিয়ে, গুটিগুটি ফেরত ও প্রত্যেকের পায়ে পা লাগিয়ে নয়া ফ্যাচাং শুরু। তাঁর নামে এই মেয়ে-পাবলিকদের নাম। গাঁয়ের দিকে শনিবাঁকড়ো বলে ডাকা হয়। এই মেয়ের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র আপনাকে বলবে, ওই লাল সোয়েটার অনেকক্ষণ থেকে আমার দিকে অসভ্য করে তাকাচ্ছে। যাও, কলার চেপে ধরো। বাসে উঠলেই বলবে, ফিসফিস করে ওই লোকটা আমাদের দেখে বাজে কথা বলছে। যাও, জেরা করো কী বলল। দক্ষিণেশ্বরে চুবড়ি নিয়ে তেভাঙা হয়ে দাঁড়িয়েই বলবে, ওই লোকটা মিথ্যে কথা বলে আমাদের সামনে ঢুকে গেল। যাও ব্যবস্থা করো। কিছু না পেলে বলবে, আজ কোথাও যেতে হবে না, আমাদের বাড়ি চলো। আপনি উল্লসিত, বাড়ি ফাঁকা বুঝি? না, বাড়িওলা কাল আমাদের টাঙানো কাপড়ে কাগের গু ফেলেছে। তুমি একটু কথা বলো। আপনি প্রেম করেছেন, লাস্ট সিনে আপনাকেই ভিলেন-শায়েস্তা করতে হবে, আশ্চর্য কী? এক বর্মহীন নাইট বই তো আর কিছুই নন! এবার অচেনা লোকের সঙ্গে আপনি ক্যাঁও-ক্যাঁও কলহে জড়াবেন, গোল হয়ে লোক জমবে, বাইসেপ-বিলাস, কেলেংকীর্তন, রসালো কমেন্ট, বিছুটি বিতরণ, পুরো সময়টা শনিবাঁকড়ো কিন্তু সিন থেকে বহুদূরে ঘাপটি। পুরুষমানুষদের গোলমালে সে থাকতে যাবে কেন শুধুমুধু? সব হয়ে গেলে, আপনার হাসিমুখ সন্ধেটা বালিকিচকিচ জিভে ও কাঁকরচালানি মনে খাবি খেলে, সে গলির বাঁক থেকে আবির্ভূত হবে, হাতে লাল ওষুধ। আপনার কাটাছেঁড়ায় লাগাবে, ঠান্ডা ফুঁ দেবে, চুমুচামা যথাবিধি। তারপর ট্যাক্সিতে উঠেই অব্যর্থ বুঝতে পারবে, মিটারে কারচুপি। আপনাকে কনুই দিয়ে খোঁচাবে ও ফিসফিসাবে, গাড়ি থামাতে বলো, থানায় নিয়ে চলো, ইয়ার্কি পেয়েছে, এত তাড়াতাড়ি বারো টাকা ওঠে? মাঝেমাঝে মনে হয় না, এর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার আগে বায়ু ছিল কী ফ্রেশ, পৃথিবী চক্রান্তবিহীন? সংকটতারণ বডিগার্ডের চাকরি পাওয়ার আগে স্বাধীন যৌবন কেমন তুরতুরিয়ে রাস্তা পেরোত? এখন আপনার বাসে উঠেই চোখ পড়ে, ওই লোকটা ব্যাগ পাশে রেখেছে কেন, কোলে রাখার কথা তো। বিষণ্ণ কিশোরী দেখলেই ভুরু কুঁচকে যায়, সিওর মাসতুতো দাদা অ্যাবিউজ করে। খবরের কাগজওলা দেখলেই মনে হয়, শালা ঠিক টাইম্‌স-এর বদলে টেলিগ্রাফ দিয়ে চলে যাবে। হয়তো শনিবাঁকড়ো ঠিকই বলে, চারদিকে ব্যাকটেরিয়ার মতো থিকথিক করছে অন্যায়, এবং প্রতিকার জরুরি। হয়তো বীরের বেদিতে আপনার আরোহণ আলাভোলা ভীরুতার চেয়ে ভাল। এই যে আপনি মুখে মুখ সাঁটিয়ে অপেক্ষা করছেন, কখন পরবর্তী খ্যাকানিতে আপনাকে লেলিয়ে দেওয়া হবে, সারাদিন ছাই দিয়ে মাজছেন খুলিচিহ্নওলা আংটি, ন্যায় রটাবেন—প্রেমের এর চেয়ে অবদান আর কী-ই বা? তবে, ভুবনের ভারটা নিজে না নিয়ে টুপুস করে আপনার ঘাড়েই পাস করল কেন, তা নিয়ে মাঝেমাঝে ধন্দ জাগে, না?

শেষবেশ ওই তো

এই মেয়ে ভুরু ব্যথা করে পৃথিবী পর্যবেক্ষিয়ে সার বুঝেছে :



ছেলেরা চায় শুধু যৌনতা। সাত সেকেন্ড অন্তর ইয়ের কথা ভাবে। মুখ নয়, বুকের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। ফলে যে কোনও ঝগড়ায় যখন মেয়েটি কোণঠাসা, আপনি যখন চেঁচিয়েমেচিয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছেন কৈফিয়ত দাবি করছেন ফুঁসছেন গনগনে ইস্তিরির মতো, এ মিটিমিটি হেসে ব্লাউজের বোতাম খুলতে সুরু করে। আরে! হল কী? কী আবার? এই তো তোমার রাগের ওষুধ। গোড়ার দিকে এ-ধরনের যুক্তিপ্রয়োগ আপনার মন্দ লাগত না। এখন মাথায় ছ'গ্যালন রক্ত চড়ে যায়। একটা কোশ্চেন জিগ্যেস করছি, সেটার উত্তর দাও। তোমার বাবা যখন স্পষ্ট জিগ্যেস করলেন, কেন আমার কথা বললে না! উত্তরে, ভিজে চুমু। আশ্লেষ। সেদিন যে মংলিদের পার্টিতে আসবে না, আমাকে একটা ফোন করে জানালে না কেন? নিজের ফোন বন্ধ ছিল কেন? আমি হুব্বার মতো রাতবিরেতে ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছি! উত্তরে আঁকুপাঁকু আলিঙ্গন, ভারী শ্বাস, নেলপালিশ ঝিকিয়ে শার্ট ছিঁড়ে ফেলা। এই 'উত্তরে থাকো যৌন' নিয়ে আপনি কী করবেন? এ যে ছেলেদের সম্পর্কে এক পঙ্‌ক্তির মানে-বই গাঁতিয়ে পড়ে ফেলেছে। সরল কষে উত্তর পেয়ে গেছে, পুংজাতির সকল রোগের একটিই সর্বার্থসাধক ঔষধ। ছেলেদের প্রশ্রয় দাও, সঙ্গে ঘোরো, হইচই করো, এবং মনে রাখো, এরা পোশাক-পরা লিঙ্গমাত্র। হর-প্রহর সেমি-উত্থিত। ফলে যে কোনও ফ্যাসাদ, বিতণ্ডা, জিভকাটা ভুল, সব একটি মন্ত্রে ম্যানেজযোগ্য, একটিমাত্র বাঁধা ঘুষপ্রয়োগে সকল সমস্যা গায়েব। কথাটা খুব ভুল নয়, কিন্তু সবসময় ঠিকও নয়। অন্তত, অভ্যেস হয়ে যাওয়া শরীরের ক্ষেত্রে তো নয়ই। আর সেই শরীর আনন্দে নয়, প্রেমে নয়, আপোসে ও মিটমাটে, 'মিউচুয়াল' করে নিতে, পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে জানলে তো আরও নয়। বরং গা ঘিনিয়ে ওঠে। আজকাল যখন লাস্য লাস্য ঢং করে জামাকাপড় খোলে, ইচ্ছে করে না, দিই একটা সপাটে কষিয়ে? সেবার ড্রামা ক্লাবের অতীনকে নিয়ে তুলকালামের পর আপনার সওয়ালের চোটে বেকায়দায় গুঁজড়ে শেষে যখন ক্ষতিপূরণ হিসেবে বেসিক ইনস্টিংকট-টাইপ দাপিয়ে দাপিয়ে গোঙাল, নিজেকে কী ঠকে যাওয়া লাগল না? প্রতারিত? মনে হল না, মেয়েটা বরং আপনাকে সরাসরি 'ভাই শিশ্ন' বলে ডাকলে পারে?

রবিনকৌড়ি

আসল নাম 'রবীন্দ্রক্রোড়ী'। অপভ্রংশ হয়ে এমনটা হয়েছে। এরা নিজেদের রবিবাবুর সাক্ষাৎ দেবদাসী মনে করে। রাত্রিকে মনে করে রবিবাবুর আলখাল্লা। শান্তিনিকেতনের ধুলো চাটে। ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছে। এখন প্রতি মুহূর্তে কোনও না কোনও গানের কলি বড় এলাচের দানার মতো চোয়ালে নাড়াচাড়া করে। ফলে, যে কোনও বাক্যই হয় এই গোছের, 'মা, একটু ওমলেটটা ইঁয়্যায়্যাখোঁনোঁ তাঁআঁআঁরে চোঁখেঁ দেঁখিনিঁ সস দিয়ে বিপিনকাকুকে শুঁধুঁ বাঁয়াঁশিঁ শুঁন্যাছিঁইঁইঁ দিয়ে এসো না!' এ জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে আপনাকে ঘিরেছে না-হক সাতাত্তর বার, তেতাল্লিশ মুহূর্তে আপনিই ওর প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি মনের আনন্দ হয়েছেন, প্রভু-কাম-প্রিয় তো বটেই, এমনকী রাস্তা ক্রস করার সময় আপনার হনহন হাঁটুনির তাল না রাখতে পেরে পিছিয়ে পড়লে 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো' গায়। সমস্ত বাংলা বলে চিবিয়ে দুমড়ে তার সঙ্গে আধো আধো ন্যাকামি মিশিয়ে, হ্যারিকেন সাইজের টেরাকোটা দুল, ন্যাতামার্কা সুতির

শাড়ি, কাঁসার থালার চেয়েও বড় টিপ পরে সিনেমা হল-এর সামনে নতমুখী একক প্রদর্শনী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বহুদূর থেকে হেঁটে আসে স্লো মোশনে লতিয়ে লতিয়ে, যেন তাড়া করলে প্রসব হয়ে যাবে। ইদানীং লক্ষ করেছেন, শীৎকারের সময়ও কোমল নি লাগাবার চেষ্টা করে। বাঁদরলাঠি-কে অমলতাস বলার প্রতিজ্ঞা একে আপাদমাথা একটি ভণ্ড বোষ্টমী করে ছেড়েছে। আলাপের পর প্রথম প্রথম সহসা ডুকরে উঠলে আপনি আঁক করে উঠতেন, এখন বুঝে গেছেন একটি বিলম্বিত গানের প্রিল্যুড ভাঁজছে, চিমটি কেটে হাসি চেপে রাখতে হবে, পুরুত স্তোত্র পড়লে গম্ভীর হয়ে থাকা নিয়ম। মিষ্টি ফোকলা বাচ্চার ভাতে অবধি ম্যাড়ম্যাড়ে মলাটওলা রোববাবুর বই দিল যেবার, আপনি প্রমাদ গুনেছিলেন। যে কোনও বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব এলেই শান্তিনিকেতনের নাম বলে, স্টেশনে নেমে টানা টানা চোখের ভান করে এমন তাকায় ও ফোঁস ফোঁস শ্বাস টানে, যেন 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' শুরু হচ্ছে। পরিত্যক্তা নারী অ্যান্দিনে নিজ এক্স-এর প্রাঙ্গণে আইলা। এ মেয়ে আপনার নয়, এমনকী নিজেরও নয়, এর ঠোঁট কাঁপানো থেকে চোখের পাতা ফড়ফড় একটি নির্দিষ্ট জ্যামিতির নকলি, এর সাড়ম্বর আদিখ্যেতা রুচির ভড়ং ধরে কিঞ্চিৎ এগোবে। রাস্তায় কুকুরছানা দেখে 'আঁমাঁয় এঁনেঁ দ্যাঁও নাঁ, উঁম্যাঁ সুঁন্দোওঁওঁর!' বলে পটপটে আহ্লাদ করছিল আর আপনি সত্যিই একটাকে তুলে কাছে আনতে কী তড়াক ঘৃণাবাচক লম্ফ দিল মনে নেই? প্রেমিকার মুখের কাছে মুখ নিয়ে, মশাই, অন্যের অগুরু শোঁকার চাইতে নিজস্ব দুর্গন্ধ টেস্ট করা ভাল। নয় কি?

জ্ঞান জ্ঞানী জ্ঞানার্দন

সব জেনে গেছে। সব বুঝে গেছে। যে কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামতটুকু ঠোঁট ও মাড়ির মধ্যিখানে দোদুল ঝুলছে। মারাদোনার বাঁ পা কেন ডানের তুলনায় বেশি চলে, জানে। যিশু জীবনের শেষদিকে কাশ্মীরে এসেছিলেন কি না, জানে। কোন বাঙালি কবি কোন বাঙালি কবির বউয়ের সঙ্গে শুচ্ছেন, জানে। শহর থেকে ট্রাম তুলে দিলে চড়াই পাখি বাড়বে কি না, জানে। বাচ্চাদের কোন বয়সে থাবড়া মারলে ট্রমা শুরু হয়, জানে। সেতারের লাউ কোন গাছ থেকে পাড়তে হয়, জানে। আপনি যদি পাও ভাজি মুখে তুলে পরম আরামে 'আঃ' বলেন, তক্ষুনি ঝাঁঝিয়ে বলে দেবে ফ্যাটি লিভার হতে আপনার ক'মাইল বাকি। যদি বেলুনওলার ঝাঁপিতে ঘুরঘুর রঙিন পাখা দেখে উজ্জ্বল মুখে চেয়ে থাকেন, তক্ষুনি শিখিয়ে দেবে ওর মধ্যে শিশুশ্রমের বিষাক্ত অমানবতা মিশে রয়েছে। যদি একটা লোকের অভিনয় দেখে বলেন 'বাহবা', অমনি ফুকারি উঠবে, 'ওর কোনও ক্রেডিট নেই, নিজের জীবনে দু'টো বউ ছেড়ে চলে গেছিল, সেটাই জাস্ট কপি-পেস্ট করে দিয়েছে।' যদি বস্তি উচ্ছেদ দেখে 'চ্চুক চ্চুক' করেন, উপদেশাবে, 'শিল্পবিপ্লব এভাবেই হয়, এবং প্রগতি। গরিব-দরদ দেখাবার আগে অ্যাটি লিস্ট কলোনির ইতিহাসের চতুর্থ চ্যাপটার পড়ে নিও।' আপনি কোনও স্বতঃস্ফূর্ত হা বা হি বা হ্যাঁ বা হো যাতে কক্ষনও বের না করতে পারেন, তার ব্যবস্থা পনেরো দিনে করে দেবে। পরম আদরে আপনাকে গোড়া থেকে মানুষ করবে। জ্যোতি সাংঘাতিক : কেতায় ইংরিজি বলবে, দুরন্ত চাকরি করবে, দেড় মিনিটে সকলের মনোযোগ তুড়ি মেরে টেনে নেবে, বন্ধুবান্ধবরা আপনার চয়েস ও ভাগ্য দেখে পিঠ চাপড়াবে ও হিংসেয় জ্বলে কাঠকয়লা হয়ে যাবে, আপনি কিন্তু ততক্ষণে শুনছেন আপনার ঠোঁটের বাঁদিকে হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনি আদৌ ভালবাসছেন না, ভান করছেন মাত্র, দোষটা আপনারও নয়, আপনার পিউবার্টি-র সময় অপর্যাপ্ত মাতৃস্নেহের, তা ছাড়া আপনার বাবা শেখায়নি কেন দাঁত মাজার পর ফ্লস করতে? নিজেকে গুটিয়ে অ্যাত্তোটুকু করে নিয়ে সমৃদ্ধ কেন্নো হয়ে বসবাস করবেন, সকালে চোখ খুলেই জানবেন সারাদিন যা যা ভাববেন সব ভুল, চুল আঁচড়েই বুক দুরদুরিয়ে মনে পড়বে



চিরুনি পারফেক্ট সমকোণে রাখার কথা, প্রেমিকাগর্বে সফেটা ফুলে থাকবেন থাইরয়েডের মেজদা-র মতো। ঠোঁট সেলাই করে রাখবেন একটা সমঝদার হাসি দিয়ে, সিনেমায় একটা সিন হঠাৎ ভাল্লেগে গেলে প্রথমেই ওর দিকে তাকাবেন, কেউ জোক বললে ওর হাসির অনুপাত না-বুঝে হাসার সাহস করবেন না। হইহই পার্টিতে যখন রবিশংকরকে থুড়ে নিখিল ব্যানার্জিকে জিতিয়ে দিচ্ছে, কিংবা নিখিল ব্যানার্জিকে থুড়ে রবিশংকরকে (অন্য পার্টিতে), সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি থেকে আপনি খুঁটে খুঁটে নেবেন আপনার প্রেমের সার্থকতা। মনে মনে বলবেন, সত্যি, অন্য সব মেয়েছেলে কেমন ম্যাদামারা, অগা। এ দ্যাখো, হিরে ঝলকাচ্ছে। আমি দারুণ আছি, না? আর, আপনার তো কল্পনা করারও সাহস নেই যে আপনি প্রেমে সুখী নন, কারণ কুল্লে ষোলো মিনিটে ও আপনাকে তছনছ করে প্রমাণ করে দেবে, আপনি ওর সান্নিধ্যতৃষ্ণায় হাবুডুবু খাচ্ছেন, স্রেফ গ্যাস হয়েছে বলে পুরোটা অনুভব করতে পারছেন না। কালকে কে বলেছিল তিনটে ফিশ ফ্রাই খেতে?

শহিদ খুনখুনিয়া

খেলা শুরু হওয়ার তেত্তিরিশ দিন আগে থেকে গো-হেরো। প্রেম করার পরের মুহূর্ত থেকেই পেটেন্ট ডায়লগ : 'জানি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আমি কিন্তু ঠিক মরে যাব, দেখো।' এই কাল্পনিক বিচ্ছেদের দুঃখে সে এতই ম্রিয়মাণ থাকে, এখনকার মিলনানন্দ তার উপভোগ করা-ই হল না। কারও বাচ্চাকে কোলে



নেয় না, সিওর পড়ে যাবে। টেপ রেকর্ডারে হাত দেয় না, নষ্ট হয়ে যাবে। সর্বক্ষণ ভাবে তার ঘাড়ে কোপ পড়বে, পড়বেই। ঠিক কোনখানে পড়বে, এই ক্রসচিহ্ন-টা দেওয়া বাকি শুধু। 'আমি তোমার যোগ্য নই, কী করে যে আমার মতো মেয়েকে তুমি গ্রহণ করলে, কত্ত ভাল ভাল মেয়ে তোমার জন্য বরাদ্দ আছে', পার্কের বেঞ্চিতে গা ঠেকিয়ে বসে গুনগুন কাঁদুনি গেয়ে চলে। চুমুর পরেই ভাবতে বসে এই তার প্রাপ্য শেষ চুমু কি না। রাগারাগি করলে বলে, ঠিকই তো বলছ, ঠিকই তো, আমি বিরক্তিকর, ঘ্যানঘ্যানে, কান্না-কান্না। আমায় কি কারও ভাল লাগে? তুমি আনন্দঘন-দের কাছে যাও। প্রেম তার কাছে এক বিশাল বিরহের প্রস্তুতি শুধু। পেছনে বড় বেতের ঘা পড়ার আগে মজা করে অল্প পালক বোলানো। কোলকুঁজো হয়ে সারাক্ষণ সে নিজের টাবলা-টোবলা শহিদবেদি নির্মাণ করছে। আপনি অন্যের বক্ষলগ্ন হলে তার বুক কেমন ছিঁড়ে যাবে, সেই ফাঁকা কর্কশ সন্ধেগুলো কেমন করাত-দাঁত নিয়ে ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে, কী বিশাল কান্নার সাগরে আইঢাই করে তার বাকি জীবন সাঁতার দিতে হবে, এই ভেবেই সে মুখটাকে তুম্বো করে আছে। যেদিন ফাঁকা দুপুরে প্রথম আদর হল, কী কান্না! 'প্রথম আদর' তো আর হবে না, জীবনেও কোনওদিনও না! আঁকশি দিয়ে এ মেয়ে দুঃখু টেনে আনে। আপনি যত বলেন, 'আরে, এই সন্ধেটায় আমরা যে আলোঝলমল হয়ে হেঁটে যাচ্ছি, সেটায় বাঁচছ না কেন? আচমকা মনগড়া ফ্ল্যাশ-ফরওয়ার্ডের মানে কী? এরম করলে তো প্রত্যেক পঁচিশ বছরের যুবকের উচিত যখন সে ছিয়াত্তর হয়ে যাবে আর তার দাঁত পড়ে যাবে চোখে ছানি গজাবে সেই ভাবী অ্যালবাম মনে এঁকে মড়াকান্না জুড়ে দেওয়া। তার চেয়ে আমাকে নির্নিমেষ দ্যাখো খুনসুটি করো মসলা ধোসা তারিয়ে খাও এই তো আমি তোমায় ম্যাটিনি শো-য় কী অশ্লীল সুড়সুড়ি দিলাম, ভাল না?' তত সে টপটপায়। আপনি ফোন রাখলে তবে সে রাখে, নিজে রেখে দিলেই কাট্টির ইঙ্গিত। আপনি বাসে উঠে গেলে তবে সে ওঠে। নিজে চলে গেলেই বিচ্ছেদ সিওর। মুখটা দেখলেই মনে হয়, এই বধ্যভূমির থার্ড বেল পড়ল বলে। সইতে না-পেরে আপনি যেদিন সম্পর্ক ভেঙে দেবেন, সে শুধু ছলছলে মুখটা তুলে বলবে, 'বলেছিলাম না?'

এছাড়াও আরও কিছু আছে: প-য়ের দোষউলি (প-য়ের দোষ হল, 'প্রেম' ও 'পাহারা' গুলিয়ে ফেলা। আর ভাবা: পাহারা দেওয়াই প্রেম), অপু (অপয়া-র ডাকনাম), রোদনট্রাম্পু (কথায় কথায় কেঁদে জিতে যায়), স্পন্ডিরানি (রাস্তায় বেরোলেই খটাক করে ঘাড়টাকে স্টিফ করে নেয় আর কায়দা করে হাঁটে, অর্থাৎ এবার ও রানি, আর আপনি নফর), আরও কত্ত কী। দিনে দিনে আরও গজাবে। সব তো একবারে বলা সম্ভব নয়। বই হয়ে যাবে। মারধোরও হয়ে যেতে পারে। অনেক নারী নিশ্চয় ওপরের বিবরণগুলো থেকে অনেক পুরুষকে ছবির মতো দেখতে পাচ্ছেন। অসম্ভব নয়। ঘটি আর বাঙাল পাশাপাশি থাকতে থাকতে কত জায়গায় মিলেজুলে গেল! যাগ্গে, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন।

ক্ষমা করো হে প্রভু

রূপক সাহা

জয়দেবের দোকানে আগুন লাগিয়ে পরদিন সকালে হোটেলে ফেরে পুরন্দর। হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোনে জানায়, রাতের মধ্যেই করে ফেলতে হবে দু'নম্বর কাজটা। রুটিন চেকিং-এর পর পুলিশ চলে গেলে পুজোয় বসে পুরন্দর। ফের বেজে ওঠে ডোরবেল। কে এল?

৭

ইউনিভার্সিটির চারতলা থেকে গোরা নীচের দিকে নেমে আসছিল। দোতলায় ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিপ্লবের। বাঁ দিকের করিডোর ধরে এগিয়ে আসছে। বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্নদের মধ্যে একজন। প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা, সুদর্শন। ওর এক ক্লাস সিনিয়র। ওকে দেখেই বিপ্লব হাসিমুখে বলল, 'হনহনিয়ে যাচ্ছ কোথায় গোরা? তোমাকে যে আজকাল দেখাই যায় না।' গোরা বলল, 'কয়েকটা প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত আছি ভাই। কিছু বলবে?'

'এত বড় একটা খবর তুমি চেপে গেলে?'

গোরা বুঝতে পারল না, বিপ্লব কী বলছে। দু'তিনদিন আগে ওকে সর্বভারতীয় দলিত পার্টির যুবদলের প্রধান সম্পাদক করা হয়েছে। এই খবরটা অবশ্য বিপ্লবের জানার কথা নয়। দলিত পার্টি এখনও এমন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি যে, তার সংগঠনের কোথায় কী বদল হচ্ছে, তা নিয়ে বিপ্লবের বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকবে। ও তাই বলল, 'কোন খবরের কথা বলছ বিপ্লব?'

'আরে, তোমার সিনেমায় নামার খবরটা। কয়েকটা কাগজে পড়লাম, তুমি নাকি শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকায় অভিনয় করছ?'

সেই ফোটোগ্রাফারের কীর্তি। দিন কয়েক আগে তাঁর সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন ফিল্ম ডিরেক্টর দেবাংশু ব্যানার্জি। উনি নাকি শ্রীচৈতন্যদেবের ওপর ছবি করছেন ইংরেজি ভাষায়। ভদ্রলোক এমন অদ্ভুত, বললেন, 'আপনার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের চেহারার খুব মিল আছে। প্লিজ আপনি ছবিটা করুন।' শুনে গোরার হাসি পেয়েছিল। ও তখন সরাসরি না করে দেয়। কিন্তু ভদ্রলোক প্রায়দিনই ফোন করে যাচ্ছেন। ইদানীং গোরা ফোনও ধরে না। অথচ খবরটা কাগজে বেরিয়ে গেল? শুনে গোরা হাসল, 'কাগজগুলোও আজকাল তেমন হয়েছে। ভুলভাল খবর সব দিচ্ছে। না ভাই, তেমন কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

জরিপ করার ভঙ্গিতে বিপ্লব ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত?'

গোরা বলল, 'তেমন কিছু নয়। কেন বলো তো?'

'তোমার সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলতে চাই।'

'চলো, কিন্তু যাবে কোথায়? আমি কিন্তু কফি হাউসে যাব না। কফির গন্ধটা আমার সহ্য হয় না।'

'না, না। ওখানে নয়। অন্য জায়গায় চলো। এই...খুব কাছেই।'

কথাটা শুনেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল গোরা। নীচ থেকে ওপরে উঠে আসছে ছাত্রছাত্রীরা। সবাই একবার করে ফিরে ওর দিকে তাকাচ্ছে। ফিসফিস করে কী যেন বলছে। এটা লক্ষ করে গোরা খুব মজা পেল। সিনেমার এক হবু আর্টিস্টকে ওরা দেখছে। গোরা ভেবে রাখল, বাড়ি যাওয়ার সময় রাসবিহারীর মোড়ে বইয়ের স্টল-এ ও দেখে নেবে, কাগজে ওর কী ছবি বেরিয়েছে।

একতলায় নেমে পিছনে তাকিয়ে গোরা দেখল, বিপ্লব নেই। হয়তো নামার সময় সিঁড়িতে কেউ ওকে আটকেছে। কারও সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কী বলার জন্য বিপ্লব ওকে ডাকল, তা নিয়ে গোরা ভাবতে লাগল। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিপ্লব বেশ জনপ্রিয় ছেলে। ছাত্রদের কাছে তো বটেই, শিক্ষকরাও ওকে খুব পছন্দ করেন। গোরা শুনেছে, ওর বাবা সুধাময় ব্যানার্জি রাজনীতি করেন। বামফ্রন্ট মন্ত্রীদের কাছের মানুষ। তা সত্ত্বেও বিপ্লবের মধ্যে ঠাটবাট নেই। ইউনিভার্সিটিতে ও আসে পাতালরেলে। ভাল সম্পর্ক রাখে অন্য ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গেও। বিপ্লব অনেক চেষ্টা করেছিল, গোরাকে ওদের ইউনিয়নে টানার। কিন্তু বারবার গোরা এড়িয়ে গিয়েছে। মার্কসীয় দর্শনে ও শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু মার্কসবাদী রাজনীতিতে ও বিশ্বাস করে না। আর মাস ছয়েক পর বিপ্লব ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে যাবে। সেই কারণে বোধহয় অনুরোধ করবে, ওদের ইউনিয়নের হাল ধরার। উত্তরটা কী দেবে, গোরা ভেবে রাখল।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে দু'জনে পূর্ব দিকে হাঁটতে লাগল। একে মারাত্মক গরম, তার ওপর বাস আর ট্যাক্সির কালো ধোঁয়া। গোরার শরীরটা কেমন যেন করে উঠল। কলকাতার রাস্তায় এই দূষণ ও সহ্য করতে পারে না। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ভুবনেশ্বরে এই সমস্যাটা ছিল না। শহরের রাস্তায় প্রচুর গাছপালা। বড় বড় রাস্তা, তুলনায় যানবাহন কম। দূষণও কম। গোরা শারীরিক অসুবিধে উপেক্ষা করেই বিপ্লবের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল। বেশিদূর অবশ্য হাঁটতে হল না। উল্টোদিকে একটা এয়ারকন্ডিশনড রেস্তোরাঁয় ঢুকে বিপ্লব বলল, 'কী খাবে



বলো। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

মাত্র এক সপ্তাহ আগে জ্বর থেকে উঠেছে। ডাক্তার ওকে ঠান্ডা লাগাতে বারণ করেছেন। রেস্তোরাঁর ভিতর ঢুকে পড়ে গোরার মনে হল, না এলেই ভাল হত। রেস্তোরাঁর ভিতরের ঠান্ডাটা ধক করে এসে ওর গায়ে লাগল। বেশিক্ষণ এই রেস্তোরাঁয় বসে থাকলে, ফের জ্বর অনিবার্য। আবার বেরিয়ে যেতে চাইলেও, বিপ্লব মনে আঘাত পাবে। সেই কারণে রুমাল দিয়ে মুখ আর হাত দু'টো মুছে গোরা বলল, 'আমি কিন্তু কিছু খাব না ভাই। আমি মাছ-মাংস কিছু খাই না।'

'সেকি, কোনওদিন খাওনি?'

'না। আমি পিওর ভেজিটেরিয়ান। তুমি খাও। শুধু তোমার জন্য অর্ডার দাও।'

'তা কী করে হয়! একা একা কি খাওয়া যায়? তুমি অন্তত এক গ্লাস শরবত খাও। এখানকার শরবত খুব বিখ্যাত। গরমকালে সাউথ ক্যালকাটা থেকেও এখানে লোকে শরবত খেতে আসে।'

শুনে গোরা চুপ করে গেল। শরবত খাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। আশপাশে তাকিয়ে ও দেখল, কোনও চেয়ার খালি নেই। বেশিরভাগই অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে। কাছাকাছি কয়েকটা স্কুল আর কলেজ আছে। ক্লাস কেটে ছেলেমেয়েরা এখানে এসে ঠান্ডায় গুলতানি মারছে। মুখ ফিরিয়ে গোরা দেখল, বিপ্লব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করেছে। ওর দিকে একটা এগিয়ে দিতেই গোরা বলল, 'না ভাই, সিগারেট আমি খাই না। আমার সামনে কেউ খাক, তাও চাই না। কী বলার জন্য আমায় ডেকে আনলে, বলো।'

সিগারেটের প্যাকেট ফের পকেটে চালান করে বিপ্লব বলল, 'ইউনিভার্সিটির ডিবেট কম্পিটিশন। প্রোফেসর অনিরুদ্ধ মৈত্র আজ আমাকে ডেকে, কম্পিটিশনে যারা পার্টিসিপেট করছে, তাদের নামগুলো দেখালেন। দেখলাম, এবার তুমিও আছ। সেই ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কেন? নামগুলো থেকে ঝাড়াই-বাছাই হবে নাকি?'

'ঠিক তা নয়। স্যর এবার বাছাই করা দশজনকে নিয়ে ডিবেট করতে চান। তোমার সম্পর্কে অবশ্য কোনও প্রশ্নই নেই। উনি জানেন, বক্তা হিসেবে তুমি খুব ভাল। ক্লাসে তোমার সঙ্গে নাকি ওঁর একবার তর্কাতর্কিও হয়েছিল।'

সাদা উর্দি পরা বেয়ারা অর্ডার নেওয়ার জন্য হাজির হয়েছে। মুখ ফিরিয়ে বিপ্লব অর্ডার দিতে লাগল। ওর কথাবার্তা শুনে গোরার মনে হল, রোজই আসে এবং রেস্তোরাঁতেও বিপ্লব সমান জনপ্রিয়। এক ধরনের মানুষ থাকে, যারা সমাজের সর্বস্তরে মিশে যেতে পারে। এই গুণটাই ওর নেই বলে গোরা মাঝে মধ্যে খুব আফসোস করে। উচ্চবর্গের মানুষদের ও পারতপক্ষে এড়িয়ে যায়। প্রোফেসর অনিরুদ্ধ মৈত্র তাঁদেরই একজন। গোরার মনে পড়ল, ক্লাসে একদিন উনি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পদ্ধতি নিয়ে পড়াচ্ছিলেন। তখনই স্পেশাল ইকনমিক জোন বা সেজ-এর কথা ওঠে। উনি সেজ-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সওয়াল করার সময়, গোরা আর চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিল। প্রোফেসর মৈত্র খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সেদিন। মনে হয়, এখনও তা ভোলেননি।

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গিয়েছে। গোরা জিগ্যেস করল, 'এবার ডিবেটের বিষয়টা কী, সে সম্পর্কে কি তুমি কিছু জানো? নাম দেওয়ার সময় প্রোফেসর মৈত্র আমাকে বলেছিলেন, পরে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উনি কোনও নোটিস দেননি। তোমায় কি উনি কিছু বলেছেন?'

'হ্যাঁ বলেছেন। কয়েকটা বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত একটা কনটেম্পোরারি সাবজেক্ট বাছা হল। শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সেজ অর্থাৎ স্পেশাল ইকনমিক জোন অবশ্যই দরকার। সাবজেক্টটা কেমন লাগছে তোমার গোরা? এখন এটা বার্নিং ইস্যু। সে কারণে আমিও বললাম, স্যর এই সাবজেক্টটাই রাখুন।'

বিতর্কের বিষয়টা 'সেজ' শুনে গোরা হাসল। ওকে হাসতে দেখে বিপ্লব জিগ্যেস করল, 'হাসছ কেন, সাবজেক্টটা তোমার ভাল লাগেনি?'

গোরা বলল, 'হাসলাম এই কারণে, ক্লাসে ঠিক এই বিষয়টা নিয়েই ওঁর সঙ্গে আমার মতানৈক্য হয়েছিল। ভাল-মন্দের প্রশ্ন তুলছি না ভাই। আদিবাসী সমাজকে বাস্তুচ্যুত করে, কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে, শিল্পপতিকে খুশি করার চেষ্টা—ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষমা করবে না। বিশেষ করে, দলিত আর পিছিয়ে থাকা মানুষরা। ডিবেটে যদি আমাকে বলতে দেওয়া হয়, তা হলে আমি মোশন-এর বিপক্ষে বলব। বলব, দলিতরা জাগছে। এই শোষণ আর তারা মেনে নেবে না।'

'কিন্তু শিল্পায়নের জন্য যে জমি দরকার, সেটা নিশ্চয়ই তুমি অস্বীকার করবে না।'

'তাই বলে দোফসলা, তিনফসলা জমি কেড়ে নিতে হবে? কৃষিজীবী গরিব পরিবারের অন্ন কেড়ে নেবে? তুমি একজন বামপন্থী হয়ে কথাটা বলছ কী করে? আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে হলে, এইভাবে শিল্পস্থাপন আর নগরায়ণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ আন্দোলনে হয়তো তোমরাই প্রথমে এগিয়ে আসতে। তোমাদের হল কী বিপ্লব?'

'কিন্তু শিল্পপ্রসার ছাড়া কি কর্মসংস্থান সম্ভব?'

'প্লিজ বিপ্লব, তুমি অন্তত এই ভাঁওতায় আমাকে বিশ্বাস করতে বলো না। হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা হওয়ার সময় আমাদের বলা হয়েছিল, বহু বেকার ছেলে চাকরি পাবে। ক'জন পেয়েছে বলো? অথবা বক্রেশ্বরে? তিরিশ বছর আগে পাঞ্জাবে পেপসিকো কারখানা তৈরি হওয়ার সময় ওরা বলেছিল, পঞ্চাশ হাজার ছেলে চাকরি পাবে। পেয়েছে মাত্র চারশো বিরাশিজন। যার মধ্যে দু'শো দশ জন অদক্ষ শ্রমিক। এটা আমার বানানো পরিসংখ্যান নয় বিপ্লব। লোকসভার রিপোর্ট থেকে বলছি। পাঞ্জাবকে দেখেও আমরা শিক্ষা নিইনি। আমায় বলো তো, সল্টলেকের আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে ক'জন সাধারণ ছেলে চাকরি পেয়েছে?'

বেয়ারা খাবার নিয়ে হাজির হয়েছে। নিজের প্লেটটা টেনে নিয়ে বিপ্লব খাওয়ায় মন দিল। ওর খাওয়া দেখে গোরার মনে হল, সত্যিই ছেলেটার খিদে পেয়েছিল। হালকা গোলাপি রঙের শরবত, লম্বা গ্লাসে বেয়ারা রেখে গিয়েছে। তাতে গোরা চুমুক দিল। বিপ্লব ঠিকই বলেছিল, স্বাদটা জিভে লেগে রইল। বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'কথাগুলো বলছি বলে, তুমি কিছু মনে করছ না তো?'

বিপ্লব বলল, 'কেন মনে করব? মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সবার আছে।'

'ডিবেটের জন্য আমি নিশ্চয়ই আরও ভালভাবে তৈরি হব। কাগজে পড়লাম, কমার্স মিনিস্ট্রি মনে করছে, আগামী এক বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে সেজ প্রকল্পে। এবং তার ফলে চাকরি পাবে পাঁচ লক্ষ বেকার। চাকরি হয়তো কিছু ছেলেমেয়ে পাবে, কিন্তু কত লক্ষ কৃষক জমি হারিয়ে পথের ভিখারি হবে, কত লক্ষ পরিবার বাস্তুচ্যুত হবে, কত লক্ষ লোক দুষণের কবলে পড়বে, সেই পরিসংখ্যানটা কে দেবে? এইসব প্রকল্প হবে, আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষ—মুসলিম চাষি, দলিত হিন্দু, আদিবাসী আর পিছড়ে বর্গের লোকেরা। কিন্তু পুরো ফয়দাটা তুলে নিয়ে যাবে উচ্চবর্ণের শিল্পপতিরা। মানতে পারছি না বিপ্লব। এর প্রতিবাদ হওয়া দরকার। কই, চিন তো এই প্রলোভনে পা দেয়নি? সারা বিশ্বে সেজ প্রকল্প হয়েছে আটশোর কাছাকাছি। কিন্তু চিনে হয়েছে মাত্র ছ'টি। তা নিয়েই সেখানে কৃষকদের তীব্র প্রতিবাদ, আন্দোলন, গণবিদ্রোহ চলছে। তার কতটুকু খবর আমরা রাখি? সেজ নিয়ে তোমরা—বামপন্থীরা যে সোনালি স্বপ্ন দেখাচ্ছ, তা ভিত্তিহীন।'

বিপ্লব বলল, 'সেজ প্রকল্পের কথা তো আগে আমরা বলিনি



ভাই। ওটা কেন্দ্রীয় সরকারই আইন করে উৎসাহ দিয়েছে। সারা দেশ চাইছে।'

'এইখানেই তো ভয়। দেশের মধ্যে ছোট ছোট দেশ অনেক হয়ে যাবে। সেজ প্রকল্পের আইনটা আমি পড়ে দেখেছি। কী ভয়ংকর আইন! কমপক্ষে আড়াই হাজার একর জমি এই প্রকল্পে আনা যাবে। ঊর্ধ্বতন সীমা কত, তা নির্দিষ্ট করা নেই। প্রকল্প শুরু হয়ে গেলে দেশের আইন আর সেখানে খাটবে না। শিল্পপতি, প্রকল্পে যাদের বলা হচ্ছে ডেভেলপার—সব ব্যাপারে তারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। ডেভেলপার চাইলে সরকারকে বিনামূল্যে জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। সমস্ত রকমের কর, শুল্ক, লেভি ছাড় দিতে রাজ্য সরকার বাধ্য থাকবে। পরিবেশ দপ্তরের কোনও ছাড়পত্র লাগবে না। শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার, শোষণ হলেও সরকারের শ্রমকমিশনার নাক গলাতে পারবেন না। ফৌজদারি ব্যাপারেও পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অবাক লাগছে, দেশের কোনও বড় রাজনৈতিক দলই এর বিরুদ্ধে একটা কথা বলছে না। এক্ষেত্রে বিদ্রোহ ছাড়া গতি কী?'

টানা এতগুলো কথা বলে গোরা থামল। বিপ্লব চুপ করে খেয়ে যাচ্ছে। প্লেট শেষ করা পর্যন্ত ও একটা কথাও বলল না। গোরা ইচ্ছে করেই খোঁচা দিয়ে কথা বলছে, যাতে পাল্টা যুক্তি শুনতে পায়। কিন্তু তর্ক করায় উৎসাহ দেখাল না বিপ্লব। ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া শেষ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে হঠাৎ ও বলল, 'একটা রিকোয়েস্ট করব ভাই? ডিবেটে তুমি পার্টিসিপেট করো না।'

অবাক হয়ে গোরা বলল, 'কেন বলো তো?'

মুখটা করুণ করে বিপ্লব বলল, 'এবার আমাদের ডিবেটে যে চ্যাম্পিয়ন হবে, সে কিউবা যাওয়ার সুযোগ পাবে। হাভানা ইউনিভার্সিটি থেকে ইনভিটেশন এসেছে। ওখানে ঠিক এই বিষয়টা নিয়েই আন্তর্জাতিক সেমিনার হওয়ার কথা। তুমি পার্টিসিপেট করলে আমার জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই ভাই। প্লিজ, কথা দাও, তুমি ডিবেটে আসবে না।'

বিপ্লবের চোখ ছলছল করছে। উচ্চবর্ণের একটা মানুষ ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে। এরা পারে বটে, যে কোনও মূল্যে আপোশ করে নিতে। বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় হঠাৎ গোরার মাথার ভিতরে লাল ঝিলিক দিয়ে উঠল। এই সময়টায় ও এক অজানা জগতে ঢুকে পড়ে। আজও তা হল। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে পেল গোরা। চোখের সামনেটা পরিষ্কার হতেই ও দেখল, একটা বিশাল নদীর ওপর একটা পালতোলা নৌকো ভেসে যাচ্ছে। সেই নৌকোয় ওরই মতো দেখতে একটা ছেলে বসে আছে। তার হাতে তালপাতার পুঁথি। সে পুঁথি পড়ছে। সামনে বসে অন্য এক ছেলে একাগ্র হয়ে তা শুনছে। খুব ভাল করে তাকিয়ে গোরা দেখল, কী আশ্চর্য, শ্রোতা ছেলেটা যে একেবারে বিপ্লবের মতো দেখতে। পুঁথি পড়া বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে। শ্রোতা ছেলেটা কী যেন অনুরোধ করছে। শুনে ওর মতো দেখতে ছেলেটা হঠাৎ পুঁথি জলে ফেলে দিল। শ্রোতা ছেলেটা খুব চেনা চেনা লাগছে। তার নাম মনে করার খুব চেষ্টা করতে লাগল গোরা। অবশেষে ওর মনে পড়ল। রঘুনাথ না?

দৃশ্যগুলো চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যেতেই নিজেকে সামলে নিল গোরা। তারপর ভাবার এক মুহূর্ত সময় নিল না। ও বলল, 'ডিবেটটা কবে যেন বিপ্লব? ৩১ তারিখে, তাই না? এই দেখো, একদম ভুলে গিয়েছি। ওইদিন তো আমার ভুবনেশ্বরে থাকার কথা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বিপ্লব। এবার ডিবেটে আমি পার্টিসিপেট করছি না।'

পরের এপিসোড আগামী রোববার
অলংকরণ শান্তনু দে



ব্র্যান্ডবাদশার নামরহস্য

তিনরঙা গোলক। উপর-নীচ লাল-নীল। মাঝে সাদা। সেঁটে থাকে বোতলের গায়ে, ছিপিতে। ইয়াংগিস্তানিদের 'রাইট চয়েস'—পেপসি। খেলে পেট ঠান্ডা। বদহজম গায়েব। শরীর-মন চাঙা নিমেষে। তাই তো 'ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর'!

পেপসির জন্ম ১৮৯০-এ। ফার্মাসিস্ট ক্যালেব ব্রাধাম এই পানীয় তৈরি করেন। নর্থ ক্যারোলিনার নিউ বার্ন শহরে ছিল তাঁর ওষুধের দোকান। গরমের দিনগুলোয় ক্রেতারা আসতেন ঘেমেনেয়ে। কখনও আবার ভিড়ই জমত না। ব্রাধাম ফন্দি আঁটেন। তেষ্টা মেটানোর সঙ্গে বিক্রিবাটা বাড়ানোর খুঁটিনাটি রপ্ত করেন অল্পদিনেই। পেষাই করা কোলা গাছের বীজ, ভ্যানিলা, ডাইজেস্টিভ এনজাইম 'পেপসিন' দিয়ে বানানো নরম পানীয়। প্রথমে ডাকা হত ব্র্যাড'স ড্রিংক নামেই। ১৮৯৮-এ ব্রাধাম এর নাম দেন পেপসি-কোলা। বোতলের গায়ে বসে এলোমেলো অক্ষরে 'পেপসি-কোলা' লেখা লোগো। ১৯০২-এ দোকানের পিছনদিকের ঘরটাতে খোলা হল কারখানা। আবেদন করলেন ট্রেডমার্কের জন্য, আমেরিকার পেটেন্ট অফিসে। সাধারণ পাত্র পাল্টে পানীয় ভরা হল বোতলে। ১৯০৩-এ পেপসি-কোলা অফিশিয়ালি রেজিস্টার্ড হয়। ওষুধের দোকানের বদলে এবার ভাড়া নেওয়া হল একটি গুদামঘর। সেখানেই খোলে নতুন কারখানা। বিক্রি হল ৭৯৬৮ গ্যালন পানীয়। বিক্রি বাড়তে থাকল। বাড়ল কোম্পানির শাখাপ্রশাখা। ১৯০৫-এ সামান্য রদবদল ঘটে লোগোয়। ১৯০৬-এ দ্বিতীয়বার পাল্টে যায় পেপসির লোগো। যুক্ত হয় স্লোগান—'দ্য ওরিজিনাল পিওর ফুড ড্রিংক'। ১৯৩১-এ সাংঘাতিক আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কোম্পানি। অবশেষে ১৯৩৩-এ পেপসি-কোলা কোম্পানিকে কিনে নেন 'লফ্‌ট' সংস্থার প্রেসিডেন্ট চার্লস গাথ। এরপর একের পর এক বদলাতে থাকে কোম্পানির লোগো, স্লোগান। ১৯৪১-এ পাল্টায় লোগোর রং। ওপরে লাল। নীচে নীল। মাঝের সাদা অংশে পেপসি লেখা লোগো। স্বচ্ছ, নির্ভেজাল, প্রাণশক্তিতে ভরপুর পানীয় বোঝাতেই সম্ভবত এই রংগুলো বাছা। তবে এর আসল কারণ ঠিক কী—জানা যায় না। ১৯৫০-এ লোগো উঠে আসে বোতলের ছিপিতে। ১৯৬২-তে পাল্টায় আবার। ১৯৭৩-এ চৌকো বাক্সের মধ্যে বসানো হয় পেপসি লোগো। ১৯৯১-এ পেপসি লেখাটি বসে একেবারে লোগোর মাথায়। ১৯৯৮ সালে কোম্পানির ১০০ বছর পূর্তিতে, লোগোর ওপর থেকে উঠে যায় বক্স। শুধুমাত্র তিনরঙা গোলকের নীচেই বসে পেপসি লেখা লোগো। তখন থেকে আজও একইরকম আছে। স্লোগান পাল্টেছে বহুবার। উন্নত হয়েছে মান। 'মাই পেপসি মাই ওয়ে'—এটাই এখনও পর্যন্ত পেপসির শেষ স্লোগান।

রিংকা চক্রবর্তী





Experience

GLOBAL LIVING

Kolkata West International City, an integrated township project on 400 acre at West Howrah. Phase-1 comprising of bungalows. Each unit encloses landed home, garden area, own terrace and car-parking space.

- Modern Club with all club facilities
- International standard school
- Retail & Commercial complex
- Community centre
- A fully equipped Medical Centre
- Parks & children's play area



Units ranging from 1,050 sq.ft. to 4,500 sq.ft.

KOLKATA WEST INTERNATIONAL CITY

www.kolkatawest.com • sales@kwic.co.in

Joint developers

SALIM

Universal Success Enterprises

Kolkata West International City Pvt. Ltd. **Corporate Office:** 'Chowringhee Court', 55 & 55/1 Chowringhee Road, 1st Floor, Kolkata-700071, Ph: 4002 6000-10 (11lines), Fax: 2282 8924
Site Office: Salap Junction, Howrah Amta Road & Bombay Road Crossing, Howrah-711409, Ph: 2653 8788/89, Fax: 2653 8787


STARTED SMALL
PLAYED IT BIG
MADE IT LARGE
SEAGRAM'S
ROYAL
STAG
MEGA
MUSIC
O&M 467
Music CDs
IT'S YOUR LIFE. MAKE IT LARGE.